ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন (কলেজ)

২০২৫

ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন (কলেজ)

৭৮ বি, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,

কলকাতা ৭০০০০৯

প্রার্থনা

ॐ सह नाववतु, सह नौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै।
तेजस्वि नावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै।।
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।।

রক্ষিত হোক গুরু শিষ্য দুইজন সমভাবে
জ্ঞান শক্তি সমান ভাবে ঔজ্জ্বল্য পাবে,
হে ব্রহ্ম, গুরু শিষ্য দুজনে যেন পারি
বিদ্যাফল লাভে হতে সম অধিকারী
প্রজ্ঞা-বলে তেজস্বী আর সম উদ্বোধিত,
ঈর্ষা যেন কলঙ্কিত করে না দোঁহে, পিতঃ

O God–
May knowledge permeate and protect both of us (teacher and disciple) in equal measure.
May both of us enjoy the fruits of knowledge in equal measure.
May our acquired knowledge be imbued with spirit and valour and invigorate both of us in equal measure.
May there never be any malice between us.

কমলপত্রের রূপকার যাঁরা

ডক্টর মৈত্রেয়ী রায় কাঞ্জিলাল (অধ্যক্ষা)

ডক্টর অদিতি চট্টোপাধ্যায়

অধ্যাপক অনুরাধা বসু

ডক্টর পর্ণশবরী ভট্টাচার্য

ডক্টর কস্তুরি মজুমদার

ডক্টর শ্রাবণী পাল

ডক্টর শুচিস্মিতা খাঁড়া

ডক্টর দেবযানী দাস ঘোষ

ডক্টর মধুমিতা বসু

অধ্যাপক প্রকৃতি দাস

ডক্টর ঈশিতা সাহা

অধ্যাপক নন্দন সাহা

অধ্যাপক আদিত্য সরকার

অধ্যাপক পিটার মিঞ্জ

ডক্টর ফরিদা আনোয়ার

সূচিপত্র

অধ্যক্ষার কলমে		৫
সম্পাদকীয়		৬

বাংলা

জীবনের জলছবি	অণুরিমা বসাক	৭
আমাদের রূপকথা	সম্প্রীতি দত্ত	৮
আবর্তন	শ্বেতা মুখার্জি	১০
প্রথম পাহাড়ের স্মৃতি	কানিজ জামিল	১২
রাজনীতি ও রবীন্দ্রনাথ : কিছু কথা	সুছন্দা ঘোষ	১৩
গাছপাথর	অঞ্জন হাজরা	১৭
ছবি	তিয়াষা বিশ্বাস	১৯
ছবি	সুপর্ণা রায়	২০
ছবি	প্রিয়া দাস	২১
ছবি	দেবাঞ্জনা চ্যাটার্জী	২২
চরৈবেতি	সুভদ্রা চ্যাটার্জি	২৩
আমার দৃষ্টিতে রামায়ণী কথার কিঞ্চিৎ অকিঞ্চিৎ কথা	অপরূপা চ্যাটার্জি	২৬
অজস্র ধন্যবাদ	সুভদ্রা চট্টোপাধ্যায়	৩০

English

From Nervousness to New Cconfidence : My NSS story	Aristha Mondal	৩১
The Quiet Return	Jyotika Das	৩৩
A Vision for a More Beautiful and Progressive India : Strengthening The four pillars of National Progress	Tabassum Khatoon	৩৫
Let Inspiration Breathe	Anansha Debnath	৪১
Two Abandoned Soul	Anansha Debnath	৪২
Why You Should Join NCC	Rimi Besra	৪৪
Northernization : How Bengal's culture is under threat	Rishita Mal	৪৬
Echoes of Home	Peter Minj	৪৯

Urdu

Barish ki Khushbu mein Purani Yaadein	Kainaat	৫২
Ahade Hazir aur Khudaitemadi ka maslah	Ismat Parveen	৫২
Khudi aur Khud Pasandi	Dr. Farida Anwar	৫৪

প্রচ্ছদ :- **অরিন্দম মালাকার** (অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ)

অধ্যক্ষার কলমে

যে-কোনো কলেজের প্রাণ সেই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। আবার উল্টোদিক থেকে ছাত্রীদের জন্য কলেজই সেই পরিসর তৈরি করে দেয়, যেখানে পড়াশুনা ছাড়াও নিজেদের বিচিত্র সৃজনীশক্তির প্রকাশ ঘটানোর সুযোগ পায় তারা। ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন কলেজও তার ব্যতিক্রম নয়। এই কলেজের ছাত্রীদের জন্য তাই প্রতি বছর প্রকাশিত হয় বার্ষিক পত্রিকা *কমলপত্র*। ছাত্রীদের লেখা, আঁকা, ছবিতে ভরে ওঠে পত্রিকাটি। হয়তো এদের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে ভবিষ্যতের কোনো উজ্জ্বল প্রতিভাকে। কলেজের অভিভাবক হিসেবে আমার কাছে এর থেকে আনন্দের আর কী-ই বা থাকতে পারে!

ছাত্রীদের পাশাপাশি কলেজের অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মী এবং প্রাক্তনীরা শত কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁদের সাহায্য এবং সৃষ্টি দিয়ে সমৃদ্ধ করেছে পত্রিকাটিকে। আশা করি, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের বাড়ি কমলকুটিরের নামবিজড়িত এই পত্রিকাটি কলেজের যথার্থ সম্পদ হয়ে উঠবে।

ডক্টর মৈত্রেয়ী রায় কাঞ্জিলাল

অধ্যক্ষা

সম্পাদকীয়

বসন্তকালে পাখিরা যেমন একটা দুটো খড়কুটো জোগাড় করতে করতে বানিয়ে তোলে আস্ত একখানি বাসা, তেমনি সদ্য কলেজে পড়তে আসা ছাত্রীরাও তাদের বসন্তবেলায় খাতায় একটা দুটো আঁচড় কাটতে কাটতে একদিন লিখে ফেলবে 'এক পৃথিবী'। সেই আশাতে ভিক্টোরিয়া ইন্সটিটিউশন (কলেজ) এর পক্ষ থেকে সাহিত্য পত্রিকা *কমলপত্র* প্রকাশ। ছাত্রীদের সৃজনশীল মনটিকে সাহস দেওয়া, লালন করাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা ডক্টর ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী দীর্ঘদিন অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছেন। অবসর নেওয়ার আগে তিনি তাঁর ব্যাটন তুলে দেন আমার হাতে। ইন্দ্রাণীদির স্নেহময় আস্থা, গোটা ম্যাগাজিন কমিটির অধ্যাপক আর আমাদের অধ্যক্ষা ডক্টর মৈত্রেয়ী রায় কাঞ্জিলালের নিরন্তর পাশে থাকার ভরসা আছে বলেই আমি এই কাজে হাত দেওয়ার সাহস পেয়েছি।

২০২৫ সালের শেষ দিকে হাতে এসে পৌঁছনোর কথা ছিল যে *কমলপত্রের*, তা হাতে আসতে দেরি হল। কারণ যতই অনিবার্য হোক, এই ত্রুটির জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। ২০২৫ সালের *কমলপত্রে* ছাত্রীরা প্রথম বেড়ানো, যৌথ বাড়ি, বন্ধুত্ব, বৃষ্টির গন্ধ নিয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মতো ছোটো অথচ গভীর অনুভূতি নিয়ে গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা লিখেছে। এন.এস.এস, এন.সি.সি কী ভাবে ভিতরের দায়িত্বশীল মানুষটিকে জাগিয়ে তুলছে, সেই কথাও উঠে এসেছে ছাত্রীদের লেখায়। ছাত্রীদের পরিণত মন ধরা পড়ে দেশ এবং সমাজ সম্পর্কে লেখা প্রবন্ধে। রঙে রেখায় ছবি এঁকে মনের কথা প্রকাশ করেছে ছাত্রীরা। এই পত্রিকার আর এক সম্পদ হল অধ্যাপকদের লেখা। কঠিন কথাকে ছাত্রীদের জন্য কী সহজ এবং সুখপাঠ্য করেই না লিখেছেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সুছন্দা ঘোষ এবং উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের ডক্টর অঞ্জন হাজরা। রয়েছে উর্দু বিভাগের অধ্যাপক ফরিদা আনোয়ারের প্রবন্ধ, ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক পিটার মিঞ্জের একটি চমৎকার গল্প। দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ এবং গল্প লিখেছেন কলেজের প্রাক্তনী শ্রীমতি অপরূপা চ্যাটার্জি এবং সুভদ্রা চট্টোপাধ্যায়। আশা করি *কমলপত্র* ছাত্রীদের মধ্যে আরো নতুন লেখার উৎসাহ জোগাবে এবং তাদের মধ্যে নতুন চিন্তার জন্ম দেবে।

ডক্টর অদিতি চট্টোপাধ্যায়
বাংলা বিভাগ

জীবনের জলছবি...

অণুরিমা বসাক
(তৃতীয় সেমিস্টার, সাইকোলজি, মেজর)

শেষবার বন্ধুর পাশে কোচিং-এ বসার সময়ে জানা যায় না যে এটা শেষবার। তারপর হঠাৎ করে একদিন জানা যায়, স্যার আর পড়াবেন না। তখন পরীক্ষা একদম সামনে চলে আসে, টেস্ট পেপারের বাঁধাই খুলে দুভাগ হয়ে যায় সহজেই।

তারপর পরীক্ষা শেষ। এক-আধদিন প্ল্যান করে আড্ডা হয়, দেখা-সাক্ষাৎ হয়। বাকি দিন শুধু প্ল্যান হয়, দেখা হয় না। তারপর রেজাল্ট। ফর্ম তোলা। মেরিট লিস্ট। একজনের ফার্স্ট লিস্ট তো একজনের আরো এক সপ্তাহ অপেক্ষা। একজন নিটের জন্য এক বছর গ্যাপ দেবে তো আর একজন বঙ্গবাসী। যে কলেজে সবার পড়ার কথা ছিল, সেখানে একজন একা। বাকিরা কেউ হঠাৎ দেখছে কোনো লিস্টে তার নাম নেই। কেউ চলে গেছে অন্য শহরে।

তারপর কলেজ যাওয়ার পথে স্টেশনে দেখা এক-আধবার। জড়িয়ে ধরা, 'ভাই কেমন আছিস?', 'হ্যাঁ ছবি দেখলাম তো তোর। আয় না একদিন, বসি', 'কলেজের চাপ বাঁওআ এত', 'চল্ আসি রে, বাই'। হোয়াটস্যাপ গ্রুপ চুপ করে যায়। চ্যাট লিস্টে নীচের দিকে নামতে থাকে নাম। বন্ধুর নতুন বন্ধু হয়। দুজনের আর কোনো কথা থাকে না। 'এটা আগেরবার এসে গেছে', একসাথে হিসেব করা থাকে না, বাঙ্ক থাকে না, ক্রাশকে নিয়ে খোঁচানো থাকে না, টিচার্স রুমে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া থাকে না।

ক্লান্ত সন্ধেবেলা স্কুলের পাশ দিয়ে ফেরার সময় সব খুব নিঝ্ঝুম লাগে।

আমাদের রূপকথা

সম্প্রীতি দত্ত
(সেম ৩, বি এস সি জেনারেল)

কাল ক্রিসমাস। আমাদের বাড়িতে আবার অনুষ্ঠানের তোড়জোড় শুরু। আমরা বাঙালি। তবুও এই দিনটাতে আমাদের বাড়িতে অনুষ্ঠান হওয়ার আসল কারণ আমাদের ছোট্ট বোন। তার জন্মদিন। সে বাড়ির সবার ছোট। তাই বাড়িতে অন্যদের জন্মদিন সে ভাবে পালন করা না হলেও ওর জন্মদিন আমরা সবাই পালন করি। কিন্তু অন্যান্য বারের মতো এবারেও ওকে জানানো হয় নি ওর জন্মদিনে কী কী আয়োজন করা হচ্ছে। এটা সারপ্রাইজ। জন্মদিনের অনুষ্ঠানটা হয় আমাদের বাড়ির ছাদে। সেখানে টেন্টের মতো করে ত্রিপল টানানো হয়েছে। তারপর সেই জায়গাটা সুন্দর করে বেলুন, রিবন দিয়ে সাজানো হয়েছে। আর সেইখানেই রাতের রান্না, খাওয়ার আয়োজন হয়েছে। বাড়ির বড়োরা এবং ভাইবোনেরা মিলে এই আয়োজনের কাজ করি। শুধু তাই নয়, সেদিন নানা রকম খেলা, অনুষ্ঠান করি আমরা। আমাদের বাড়িতে ক্রিসমাসের দিনটা এমন ভাবে শুরু হয়, যেন মনে হয় নতুন বছরে ভাল কিছু হতে চলেছে।

এই ভাবেই সুখে-দুঃখে আমাদের বাবা, কাকা, মা, কাকিমা, পিসি, ভাইবোনদের নিয়ে একসঙ্গে আমাদের দিন কেটে যায়। উৎসব অনুষ্ঠানের দিন ছাড়া অন্য দিন আমাদের একটা নিয়মের মধ্যে চলতে হয়। সকালবেলা বাড়ির সকলকে ছ'টার মধ্যে উঠে পড়তে হয়। মা, কাকিমা, পিসিরা আরো ভোরে ওঠেন। আমাদের বাড়ির বিভিন্ন নিয়মের মধ্যে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হল খাবার সময় মেনে চলা। সকালের ব্রেকফাস্ট শেষ হয় ন'টার মধ্যে; তারপরে দুপুরের খাবার শেষ হয় একটা থেকে দেড়টার মধ্যে; আর রাতের খাবার ন'টা থেকে দশটার মধ্যে। কিন্তু এই নিয়মের মধ্যেও কিছু সময় থাকে যখন আমরা মজা করার ফাঁক খুঁজে নিতাম। দুপুরে খাবার সময়েও হাসাহাসি, হৈ-হুল্লোড় চলে। এতে বাড়ির বড়দের খাবার দেরি হয়ে যায়। বিকেলবেলা হুড়োহুড়ি করে সবাই মিলে ছাদে খেলি — লুকোচুরি, কুমির ডাঙা, কানামাছি। ছুটির দিনগুলো কিছুটা অন্য রকম। কারণ ছুটির দিনগুলো বাড়ির সকলে মিলে কিছুটা সময় বের করে একসঙ্গে কাটাই।

পুরো বছরের মধ্যে আমাদের সব থেকে ভালো সময় কাটে গ্রীষ্মের শেষের থেকে, পুরো বর্ষাকালটা। তার কারণ বলতে গেলে বাড়ির বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন। এতক্ষণে সবাই বুঝেই গিয়েছ যে আমরা যৌথ পরিবারে থাকি। যৌথ পরিবার হওয়ার জন্য আমাদের বাড়িটা বেশ অনেকটা জায়গা জুড়ে

রয়েছে। তিনতলা বাড়ি ডানদিক ও বাঁদিক জুড়ে রয়েছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় ইংরেজি 'এল' অক্ষর। আর সামনে বেশ খানিকটা জায়গা ফাঁকা রেখে একটি একচালা বাড়ি। বাড়ির ভিতরে রয়েছে একটি বড়ো ঘর। তার দু'পাশে মাঝারি ধরনের দুটো ঘর, যার একটি রান্নাঘর এবং খাবার ঘর। আর একটি ঠাকুরঘর। আর ফাঁকা জায়গাটা হল আমাদের উঠোন। বৃষ্টির দিনগুলোতে যখন ওই উঠোনে জল জমে, তখন নৌকার পর নৌকা বানিয়ে সেগুলোকে ভাসিয়ে দিতাম সেই জলে। সে যে কী আনন্দ! তাছাড়াও গ্রীষ্মের রাতে কারেন্ট চলে গেলে সবাই ছাদে চলে যাই যতক্ষণ না পর্যন্ত কারেন্ট আসছে। আর তার মধ্যে যদি ঝড় উঠে তাহলে আমাদের আনন্দ আর কে দেখে! আমাদের তখন ঘুম উড়ে যায় ঝড়ে। মায়েদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে আমরা বাইরে বেরিয়ে ঝড় দেখি তখন।

চারপাশে ছোটো ছোটো একক পরিবার দেখে মনে হয় আমরা যদি সবাই একসাথে না থাকতাম তাহলে হয়তো এরকম আনন্দ করার সুযোগই হয়ে উঠতো না। আমাদের গলির অন্যান্য নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির বন্ধু-বান্ধবরা আমাদের দেখে দুঃখ করে তাদের এত ভাইবোন নেই বলে। তবে আমাদের পরিবারকে একসঙ্গে রাখার জন্য সবচেয়ে বড় অবদান হল আমাদের মা-কাকিমাদের। তারপরে আমাদের বাবা-কাকাদের। তাঁরা চেয়েছিলেন বলেই হয়তো আজও আমরা একসঙ্গে আছি এবং আগামী বছরগুলোতেও এইভাবে সবাই মিলে একসঙ্গে জড়িয়ে থাকব এই বাড়িতে, যেখানে কারুর মনে হবে না যে সে একা, তার সঙ্গে কেউ নেই।

আবর্তন

শ্বেতা মুখার্জি
(৫ম সেম, পদার্থবিদ্যা)

একটা বীজ পুঁতেছিলাম;
জমিটা খুব ভালো, ওরা বলেছিল,
কিছুদিন পর একটা চারা বেরোল।

ঠিক যেন একটা ছোট্ট প্রাণ, মাটি ভেদ করে বেরিয়েছে,
ছোট, নরম আর একরাশ কৌতূহল জড়ানো
দেহটা।

পৃথিবীর বুক জুড়ে সে বাড়তে থাকে।
তার স্বপ্ন নিয়েই; জল দেওয়া, সার দেওয়া, পুষ্টি জোগানো।

মাটিটা বেশ উর্বর, গাছে গাছে অনেক ফুল ধরে,
ফল ধরে।
তার সবুজ, আমোদিত সুগন্ধ, প্রাণটাকে জুড়িয়ে দেয়।

আজ দেখলাম সে গাছটা কেমন যেন নুইয়ে পড়েছে।
ভাবলাম বুঝি-বা ফুল ধরেছে, ফল এসেছে।
কিন্তু না, কিছুই তো নেই!
খুব চলল ক'দিন সার দেওয়া, জল দেওয়া।
তবুও সে নুইয়ে পড়ছে।

মাটি তো খুব উর্বর, তবে?
ধুর, এর কিচ্ছু হবে না।
ওর ঝরানো পাতা উঠোন নোংরা করছিল।
ওর আশ্রয়প্রাপ্ত মশাদের অস্তিত্ব হঠাৎই টের পেয়েছিলাম

এই সবুজ, প্রাণান্তকর সবুজ, বড্ড বিরক্তিকর।
একদিন সকালে আকাশের মুখ ভার;
টুপটুপ করে কান্না ঝরাচ্ছে
আর ওই গাছটাও তাতে যোগ দিয়েছে।

সেদিন রাত্রে ঝড় উঠেছিল,
বজ্ররোষের নির্ঘোষে চারিদিক ভরে উঠেছিল।
পরদিন ভোরে বাইরে বেরিয়ে দেখি
গাছটা পড়ে রয়েছে।
এত চেষ্টার পরও একই রকম থেকে গেল।
যাকগে।

হঠাৎ দেখি ভাঙা একটা ডালের একপাশে একটা
ফুল পড়ে, কাদা মাখা, ভেজা।
কী ফুল ভালো করে দেখতেই দেখি
পড়ে যাওয়া এই গাছের ফুল যেমন হয়, ঠিক তেমন।

কিন্তু এটা এখানে এল কীভাবে? এখানে তো আর গাছটা নেই।
ফুলটা মৃত গাছটার পাশে ঠিক তার দেওয়া
উপহারের মতন পড়ে আছে।
জানিনা আমাকে দিয়েছে? না নিজেকে!

আরও খানিকটা পাশে দেখি একটা ছোট্ট চারাগাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে।
নির্ভয়, নিশ্চিন্ত, সূর্যের আলো যেন পরম মমতায় তার গায়ে হাত বুলোচ্ছে।
ছোট্ট গাছ, ঠিক যেন একটা ছোট্ট ছানা,
ডিম ভেঙে বেরিয়েছে।
করুণাময়ী বসুন্ধরা তাকে আঁকড়ে ধরে আছে।

প্রথম পাহাড়ের স্মৃতি

কানিজ জামিল
(সেম ৫, মর্নিং সেকশন)

দার্জিলিং-এর কথা বইতে অনেকবার পড়েছি ও শুনে এসেছি। কিন্তু কোনো দিন যাওয়া হয়ে ওঠে নি। কারণ দূরত্ব আর খরচ। তবে এইসব বাধা পেরিয়ে একবার যাওয়ার সুযোগ হল। একদিন হঠাৎই বাবা আমাদের সবাইকে নিয়ে দার্জিলিংয়ে যাওয়ার কথা বললেন। আমরা মানে আমি, বাবা, মা আর ভাই। প্রথমে মালদা থেকে ট্রেনে শিলিগুড়ি পৌঁছলাম পাঁচ ঘন্টা পরে। তারপর সেখান থেকে গাড়িতে চেপে দার্জিলিংয়ের দিকে রওনা দিলাম। দার্জিলিংয়ে যাওয়ার সবচেয়ে ভাল সময় এপ্রিল থেকে জুন এবং অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস। আমরা গিয়েছিলাম নভেম্বর মাসে।

পাহাড়ী পথে গাড়ি চলল এঁকেবেঁকে। মেঘলা আকাশ কুয়াশার মধ্যে দিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে থাকলাম। ধীরে ধীরে শীত অনুভব করতে লাগলাম। এর পরে যত উপরে উঠতে লাগলাম দেখতে পেলাম পাহাড়, চা বাগান এবং বাতাসিয়া লুপের ঐতিহাসিক টয় ট্রেন। দার্জিলিংয়ের দূষণহীন স্নিগ্ধ পাহাড়ী হাওয়ায় প্রাণ-মন জুড়িয়ে যাচ্ছিল। চারপাশ দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের গন্তব্য স্থলে।

এখানে প্রকৃতি যেমন অপূর্ব, তেমনি ঘর-বাড়িগুলো। প্রত্যেক বাড়ির বারান্দা ফুলে ফুলে রঙিন, সাজানো ছবির মতো। দার্জিলিংয়ে এখন কুয়াশা-তো একটু পরেই রোদ—বিচিত্র আবহাওয়া। এখানে রাজভবনটি যে এত সুন্দর তা এখানে না এলে বুঝতে পারতাম না। যেহেতু আমরা পৌঁছেছিলাম সন্ধ্যের সময়, তাই রাতের খাবার খেয়ে তাড়তাড়ি শুয়ে পড়েছিলাম। পরের দিন ভোররাতে আমরা বেরিয়ে পড়লাম টাইগার হিলের দিকে। তখনো আকাশে চারপাশে অন্ধকার, ঠাণ্ডা হাওয়া। হঠাৎ পুব আকাশে হালকা আলো দেখা দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে সূর্যের প্রথম কিরণ পড়তেই কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়াগুলো আলোয় ঝলমল করে উঠল। দেখে মনে হল, ঈশ্বর যেন স্বয়ং এসে দাঁড়ালেন।

এরপরে টয় ট্রেনে চড়া আর এক আকর্ষণীয় রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। তারপর গেলাম ঘুম মঠে। চারিদিকে শান্ত পরিবেশ। ঢুকেই মনে হল এক অন্য জগতে প্রবেশ করলাম। দার্জিলিংয়ে এসে চা বাগান না দেখলে ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বিস্তীর্ণ পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে সারি সারি চা গাছ, আর পিঠে ঝুড়ি নিয়ে নারী শ্রমিকেরা চা পাতা তুলছে। এরপর পাশের এক চায়ের দোকান থেকে গরম চায়ে চুমুক দিতেই ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীর গরম হয়ে উঠল।

দার্জিলিংয়ের মানুষের জীবন অতি সাধারণ। দোকানে দোকানে উলের পোশাক, কাঠের জিনিসপত্র, সন্ধ্যা নামলে কুয়াশা। মনে হচ্ছিল পৃথিবীর সব সৌন্দর্য আমাদের চারিদিকে এসে মিশে গেছে। বাড়ি যাওয়ার দিন আমাদের মন ভারি হয়ে এল। ইচ্ছে হচ্ছিল এখানেই থেকে যাই। এমন জায়গা ছেড়ে যেতে কারুরই বা মন চাইবে! তাই বাবাকে বললাম, আর একটা দিন থেকে যেতে। কিন্তু সেই আবেদন মঞ্জুর হল না। ফলে মন খারাপ করে ফিরে যেতে হল নিজের বাড়িতে। কিন্তু প্রথম পাহাড়ে যাওয়ার স্মৃতি মনে থেকে গেল ছবির মতো।

রাজনীতি ও রবীন্দ্রনাথ : কিছু কথা

সুছন্দা ঘোষ
(অধ্যাপিকা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)

ইউরোপ এবং আমেরিকা বা সামগ্রিকভাবে ধরতে গেলে ভারতের বাইরে সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল মূলত এক কবি ও শিল্পী হিসেবে। তিনি যে রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রেও এক অতি অগ্রগামী মানুষ ছিলেন সে কথা তাঁর জীবদ্দশায় রম্যাঁ রলাঁ প্রমুখ দু-একজন ছাড়া পশ্চিমের অনেকের কাছেই অজানা ছিল। শুধু পশ্চিমে বা বিদেশেই কেন নিজের দেশেই কী রাজনৈতিক চিন্তক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট স্বীকৃতি পেয়েছেন? এটা অবশ্যই বিতর্কের বিষয়।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাবনার বিস্তার সম্পর্কে তেমন ভাবে অনেকেই ওয়াকিবহাল নন। কিন্তু পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ও লেখনীর গভীর বিশ্লেষণ করলে তাঁর রাজনৈতিক সত্তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শুধু কবি বা সাহিত্যিক হিসেবেই নন, রাজনৈতিক চিন্তক হিসেবেও তিনি সমকালীন ভারতবর্ষে এক গভীর ও স্থায়ী প্রভাব রেখেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি লিখতে শুরু করেছিলেন। তাঁর ''মন্ত্রী অভিষেক'' প্রকাশিত হয় উনবিংশ শতকেই। ১৮৯০ সালের ১৫ মে। ''আত্মশক্তি'', ''ভারতবর্ষ'', ''স্বদেশ'' এবং ''সমাজ'' এর অধিকাংশ প্রবন্ধও প্রকাশিত হয় ১৯০৮ এর ঢের আগে। কিন্তু তবুও অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিদের কাছে রবীন্দ্রনাথের একমাত্র পরিচয় ছিল যে তিনি কবি সাহিত্যিক শিল্পী। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার প্রতি বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের পেশাদার রাজনীতিকরা কোনও গুরুত্ব প্রায় কখনওই আরোপ করেন নি। আর তাই সখারাম গণেশ দেউস্কর রবীন্দ্রনাথকে কটাক্ষ করে বলেছিলেন, ''কবিতা লিখিয়া ভারতোদ্ধার হইবে না। আর এখানেই বোধ হয় বাঙালি তথা ভারতবাসীদের দুর্ভাগ্য''। আমাদের শেখানো হয় নি যে শুধু কবি, সাহিত্যিক বা শিল্পী হিসেবেই নয়, রাজনৈতিক চিন্তক হিসেবেও রবীন্দ্রনাথ এমন উচ্চতায় পৌঁছেছিলেন, যে-উচ্চতায় তাঁর সমকালে ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতাই পৌঁছাতে পারেন নি। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন যখন হিন্দু জাতীয়তাবাদী শক্তির হাতে আত্মসমর্পণ করেছিল, বা বয়কট আন্দোলন যখন দেশবাসীর মধ্যে সরাসরি বিভাজন সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়েছিল, কিংবা ১৯৩০ এর দশকে যখন হিন্দু মুসলমান অনৈক্যের বীজ ক্রমশ মহীরুহের আকার ধারণ করতে শুরু করেছিল তখন প্রতিবারেই রবীন্দ্রনাথ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সে বার্তায় প্রায় কেউই কান দেন নি। আজ যখন আমরা সেই দিনগুলির দিকে ফিরে তাকাই আর স্মরণ করি রবীন্দ্রনাথের সতর্কবাণীকে, তখন এ কথা আমাদের মনে না হয়ে পারে না যে তিনি যেভাবে দেওয়ালের লিখন পড়তে পেরেছিলেন তা যদি তাঁর সমসাময়িক রাজনৈতিক নেতারা পড়তে পারতেন তাহলে হয়তো ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসই বদলে যেতে পারত।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের বেশ আগে থেকেই বাংলাদেশের হিন্দু-সমাজে পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু

করে, যে-পরিবর্তন নিয়ে আসেন হিন্দু কলেজের ছাত্ররা। সমকালীন আচারসর্বস্ব হিন্দু-সমাজের গোঁড়ামি আর অচলায়তনের বিরুদ্ধে তাঁরাই প্রথম প্রতিবাদ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই বাংলার গোঁড়া হিন্দুসমাজে পরিবর্তন সূচিত হয়। রামমোহন বিদ্যাসাগর যে সামাজিক বেড়াজাল অতিক্রম করার লড়াই শুরু করেন, আরও আগে সেই পথ ধরেই পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করে। পরিবর্তনের এই ঢেউয়ের মধ্যেই জন্ম গ্রহণ করেন রবীন্দ্রনাথ। পারিবারিকভাবেও উদার পরিবেশে বড় হয়ে ওঠেন তিনি। স্বভাবতই তিনি সব দিক থেকে সমাজের অচলায়তন ভাঙার চেষ্টা করেন। সমাজের মূল ধরে নাড়া দিয়ে তার ক্ষতগুলিকে তুলে ধরেন তিনি।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে স্বাদেশিকতার চর্চা বরাবরই ছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং জীবনস্মৃতিতে লিখে গেছেন বাল্যকালে তাঁর বাবার শাসনে পরিবারের পরস্পরের মধ্যে ইংরেজিতে কথা বলা অপমানজনক বলে গণ্য হত। ঠাকুরবাড়ির উদ্যোগেই স্থাপিত হয়েছিল হিন্দুমেলা বা জাতীয় মেলা যার মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশের মানুষের দ্বারা স্বদেশের উন্নতি করা। এই হিন্দুমেলার এক অধিবেশনেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে রবীন্দ্র-ভাবনার জগতে এক নতুন পর্যায় সৃষ্টি হয়। এই পর্যায়ে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তাঁর যোগদান ও ভূমিকার মধ্যে দিয়ে কবিগুরুর রাজনৈতিক সত্তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। পরবর্তী নানান অধ্যায়েও তাঁর মনন ও কলমে রাজনৈতিক চিন্তা প্রকাশিত হয়। তবে এই লেখায় সংক্ষেপে বঙ্গভঙ্গ পর্বের দিকেই আলোকপাত করার চেষ্টা করব। ১৯০৩ সালে ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। ধর্মের ভিত্তিতে বাংলাভাষী অঞ্চল ভেঙে দিয়ে বাঙালি জাতিকে দুর্বল করে দেওয়াই ছিল এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। এর প্রতিবাদে ১৯০৪ সালে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সমাজ নামে একটি ভাষণ পাঠ করেন মিনার্ভা থিয়েটারে। এই ভাষণে তিনি দেশের আত্মশক্তি জাগরিত করার জন্য জেলার মেলাগুলিকে নতুন করে উদ্যোগ নিয়ে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্ভাব স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তার উপরে গুরুত্ব দেন। তিনি মনে করতেন যে বিদেশী শাসকের আঘাত ভারতের কাছে শাপে বর হয়েছে। আত্মশক্তি প্রবন্ধে তিনি লিখলেন, ‘আমাদের যে শক্তি আছে তাহা বিদেশ হইতে বিরোধের আঘাত পাইয়াই মুক্ত হইবে’। তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্যে সর্বপ্রথম জাগাতে চেয়েছিলেন দেশের মানুষের আত্মশক্তি। কোনও আপাত সহজ শর্টকাট পদ্ধতি তাঁর কাম্য ছিল না। কারণ তিনি জানতেন, সে পথে গেলে বিপর্যয়ের সম্ভাবনাই বেশি। দুঃখের বিষয় সমসাময়িক রাজনৈতিক নেতারা রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনাকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেন নি। তাঁরা বোঝেন নি যে রবীন্দ্রনাথই সঠিক পথনির্দেশ করেছেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ভূমিকার জন্য বাংলা তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। যেদিন বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব কার্যকর হয় সেই ১৯০৫ এর ১৬ অক্টোবর তিনি ছিলেন কলকাতার রাজপথে, প্রতিবাদ মিছিলের পুরোভাগে। দুই সম্প্রদায়ের রাখিবন্ধনের মাধ্যমে তিনি সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। অজস্র গান রচনার মাধ্যমে তিনি এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলেন। প্রায় একমাস ধরে তিনি তেইশটি দেশাত্মবোধক গান লেখেন যা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেরণা ছিল।

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল বলেছেন, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ চারণকবির ভূমিকা নিয়েছিলেন। গান্ধীজির পূর্বে ভারতে জনগণের নেতা হিসেবে এমন ভূমিকায় একমাত্র রবীন্দ্রনাথকেই দেখা যায়।

কিন্তু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতি অচিরেই রবীন্দ্রনাথের মোহভঙ্গ হয়। বিলিতি দ্রব্য বয়কট নিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের জোরজবরদস্তি এবং এই আন্দোলনে হিন্দুপন্থী রাজনীতির অনুপ্রবেশ ছিল তার মূল কারণ। দেশহিতের নামে অন্যায় পীড়ন, সন্ত্রাস সৃষ্টি, দস্যুবৃত্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতার কঠোর সমালোচনা করেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ঘরে-বাইরে উপন্যাসে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের রাজনীতির প্রতি তাঁর মনোভাবের স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। আবেগের বশে যুক্তিহীনভাবে কোনো বিষয়ে ঝাঁপিয়ে পড়াকে কখনই সমর্থন করেন নি রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ব্যর্থতার একটি অন্যতম কারণ হল, বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ ছিল এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথ এর মূলে গিয়ে দেখিয়েছেন, বহুদিন থেকেই হিন্দুদের মধ্যে মুসলমান বিদ্বেষ ছিল। ইংরেজরা শুধু সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন মাত্র। বিভেদের অস্ত্র ইংরেজের হাতে তুলে দিয়েছেন দেশের মানুষরাই। রাজনীতির প্রয়োজনে মুসলমান সম্প্রদায়কে ব্যবহার করা হবে। অথচ অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁদের অসম্মান করা হবে। এই দ্বিচারিতা রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেন নি।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় স্বাদেশিকতা বলতে মূলত হিন্দু স্বাদেশিকতাকে বোঝাতো। এর বিরুদ্ধে যিনি রুখে দাঁড়ান তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সামগ্রিকভাবে ভারতের স্বাজাত্যবোধের চেহারায় হিন্দু জাতীয়তাবোধের প্রবেশ ভারতীয় মুসলমান সমাজে এক বিপুল অবিশ্বাস আর সন্দেহের জন্ম দিয়েছিল। যার খেসারত ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষকে নানাভাবে দিয়ে আসতে হয়েছে। এবং সে কথা বুঝেই রবীন্দ্রনাথ প্রথমে হিন্দু পুনরুত্থানের সঙ্গে একাত্মবোধ করলেও খুব দ্রুত নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিপদের বিরুদ্ধে দেশের মানুষকে সতর্ক করে দেন। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের চরিত্রের মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেন হিন্দু জাতীয়তাবাদের ভয়াবহ চরিত্র যা মুসলমান জনগোষ্ঠীকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন করে ফেলছিল। তখন থেকেই শুরু হয় রবীন্দ্র-ভাবনার জগতে এক নতুন পর্যায় যখন তিনি হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। রবীন্দ্রনাথের এ পরিবর্তনের ছবি পাওয়া যায় তাঁরই সৃষ্ট 'গোরা' চরিত্রের মধ্যে। 'গোরা' উপন্যাসের প্রথম দিকে আমরা দেখি 'গোরা' তার মা 'আনন্দময়ী' কে বলছে, 'তোমার ঐ খৃস্টান দাসী লছমিয়াটাকে না বিদায় করে দিলে তোমার ঘরে খাওয়া চলবে না' (রবীন্দ্রনাথ, গোরা ৬৩৫)। আর উপন্যাসের শেষে সেই 'গোরা'-ই তার মাকে বলে, 'এইবার তোমার লছমিয়াকে ডাকো। তাকে বলো আমাকে জল এনে দিতো' (রবীন্দ্রনাথ, গোরা ৯২৫)। তাঁর রচিত উপন্যাসের নায়ক যেমন হিন্দু জাত্যভিমান ভুলে বলে ওঠে, 'আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন' (রবীন্দ্রনাথ, গোরা ৯২৩)। ঠিক তেমনই রবীন্দ্রনাথ নিজেই হিন্দু জাতীয়তাবাদের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলেন। আর নিপুণভাবে নিজের পরিবর্তনের ছবি এঁকে রেখেছেন তাঁর দিগ্বিজয়ী উপন্যাসের মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাবনা জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ সীমানা অতিক্রম করে আমাদের বিশ্বমানবতা বোধের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে দেয়। স্বদেশের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন পৃথিবীর কথা।

মানুষের সভ্যতার কথা। বর্বর নাৎসি ফ্যাসিস্টদের হাত থেকে মানুষকে বাঁচানোর কথা। ফ্যাসিবাদ নাৎসিবাদ সাম্রাজ্যবাদ-এ সবের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনব্যাপী। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রখর বোধ দিয়ে বুঝেছিলেন, নগরে যদি আগুন লাগে দেবালয়ও তখন রক্ষা পায় না। বুঝেছিলেন, পৃথিবীতে ফ্যাসিবাদ-নাৎসিবাদ জয়ী হলে ভারতও নিরাপদ থাকবে না। তিনি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। বস্তুত 'ন্যাশনালিজম্' প্রবন্ধমালায় তিনি এমন কথাও বলেছেন যে জাতীয়তাবাদ এক মারাত্মক দুষ্ট ব্যাধি (রবীন্দ্রনাথ, ন্যাশনালিজম্ ৭৪০)। রবীন্দ্রনাথের অল্পবিস্তর চর্চা যাঁরাই করেছেন তাঁরা সকলেই জানেন, রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রকে বরাবর সন্দেহের চোখেই দেখতেন। ইউরোপীয় ধাঁচের রাষ্ট্রের চেয়ে তাঁর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল ভারতীয় ঐতিহ্যের সমাজ, যে- সমাজে মানুষ আত্মশক্তি গড়ে তুলবে। রবীন্দ্রনাথ বরাবর রাষ্ট্রের তুলনায় ব্যক্তিকেই অগ্রাধিকার দিতেন। বস্তুত, যান্ত্রিক রাষ্ট্র মানুষের সমাজ ও সভ্যতার কী পরিমাণে ক্ষতিসাধন করতে পারে তা তিনি দেখিয়েছেন তাঁর 'রক্তকরবী' নাটকে। যেখানে আমরা দেখি উদ্ধত রাষ্ট্রযন্ত্রের তলায় পিষ্ট হচ্ছে শুধু 'রঞ্জন' নয়, পিষ্ট হচ্ছে স্বয়ং 'রাজা'। আর তাই নাটকের শেষে দেখি, 'নন্দিনী' র ডাক শুনে নিজের জাল ছিঁড়ে 'রাজা' বেরিয়ে পড়েন।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মহলে রবীন্দ্রনাথ এখনও যেন শুধুমাত্র এক প্রহরী। কিন্তু রাজনীতির মূল অঙ্গনে এখনও তাঁর প্রবেশ সীমাবদ্ধ। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা থেকে এখনও কোনও ফসল ঘরে তোলার কোনও চেষ্টাই আমরা করি নি। সারা জীবন ধরেই কবিগুরু ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি ধর্ম সম্প্রদায়গত সংকীর্ণ বিভেদ বিদ্বেষের বিপদ সম্পর্কে দেশের নেতা ও কর্মীদের সতর্ক করেছেন। কিন্তু নেতারা তাঁর কোনো কথায় আমল দেন নি। রবীন্দ্রনাথের এই সতর্কবাণীর উপেক্ষা আজ ভারতের পক্ষে অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাম্প্রতিককালে দেশে ধর্ম জাতি গোষ্ঠী ভাষা আঞ্চলিকতার বিদ্বেষ ও বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। এই বিদ্বেষের রাজনীতির উর্ধ্বে এক অখণ্ড ভারত গড়তে গেলে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা স্মরণ করতে হবে। শুধু বাঙালি জাতি নয়, ভারতের সকল জাতি গোষ্ঠী প্রদেশ ঐক্যবদ্ধ ভাবে ভারতকে সবদিক থেকে সমৃদ্ধশালী করে তুলুক এই ছিল কবিগুরুর জীবনব্যাপী স্বপ্ন।

গ্রন্থসূত্র :

১। অলকরঞ্জন বসু চৌধুরী ঃ পলিটিকসের ধূলিচক্রে রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা ঃ ভাষা বিন্যাস, ১৯৯৯

২। কৃষ্ণ কৃপালনি ঃ টেগোর এ লাইফ, নিউ দিল্লি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ১৯৮৬।

৩। সন্দীপন সেন ঃ রাজনীতির রুদ্ধদ্বার ও রবীন্দ্রনাথ, কলকাতা, অনুষ্টুপ ২০১৫।

৪। রবীন্দ্র স্মারক গ্রন্থ ঃ কলিকাতা বিশ্বভারতী, ১৯৯১

গাছপাথর

ডক্টর অঞ্জন হাজরা
(সহকারী অধ্যাপক, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ)

অতিপ্রাচীন কোনো কিছুর উপমায় যে-দুটি ভিন্ন বস্তুকে একত্রে আনি প্রায়শই, কে জানত সেই গাছ আর পাথরের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক এই প্রকৃতিতেই আছে লুকিয়ে। বলা বাহুল্য, সারা পৃথিবীর বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2)-এর ঘনত্ব বজায় থাকা সমগ্র জীবকুলের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর সাধারণ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে নিজেদের কাণ্ড, পাতা ও মূলে জৈব কার্বন (organic carbon) হিসেবে সঞ্চিত রাখার কাজ যে অবলীলায় করে চলেছে পৃথিবীর একদল জাদুকর সবুজ গাছেরা, একথা সবার জানা। বিজ্ঞানের পরিভাষায় এর পোশাকি নাম জৈবিক কার্বন মজুদকরণ (biological carbon sequestration), জলবায়ু পরিবর্তনের (Climate Change) বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যা আমাদের অন্যতম প্রধান অস্ত্র।

সম্প্রতি কেনিয়ার কিছু বিশেষ প্রজাতির ডুমুরজাতীয় (Genus : Ficus) গাছের মধ্যে বিজ্ঞানীরা এমন এক অসাধারণ ক্ষমতার সন্ধান পেয়েছেন, যা কার্বন মজুদকরণের প্রচলিত ধারণাকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ জিওকেমিস্ট্রির গবেষণা অনুসারে, এই ডুমুর গাছগুলি কেবল কার্বন শোষণই করে না, বরং এটিকে ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$) বা চুনাপাথরের মতো খনিজে রূপান্তরিত করে মাটির গভীরে স্থায়ীভাবে আবদ্ধ করতে পারে। ইউনিভার্সিটি অফ জুরিখের উদ্যোগে কেনিয়ার সাম্বুরু কাউন্টিতে তিন প্রজাতির Ficus গাছের ওপর চালানো গবেষণা এবং সে সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি এই অবিশ্বাস্য প্রক্রিয়ার ওপর আলোকপাত করেছে। গবেষকদের মতে, এই গাছগুলি একটি বিশেষ জৈব-রাসায়নিক পথে কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে একপ্রকার পাথরে রূপান্তরিত করে। এই প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া হয়েছে 'অক্সালেট-কার্বনেট পাথওয়ে' (Oxalate-Carbonate Pathway)। প্রথমে গাছগুলি বাতাস থেকে শোষিত কার্বনকে ব্যবহার করে 'ক্যালসিয়াম অক্সালেট' নামক ক্ষুদ্র স্ফটিক (Crystal) তৈরি করে। এই স্ফটিকগুলি সাধারণত গাছের কাণ্ড এবং অন্যান্য কলাকোষের অভ্যন্তরে জমা হয়। এরপর ওই গাছের পাতা বা কাণ্ডের অংশ যখন মাটিতে ঝরে পড়ে বা গাছ যখন মারা যায়, তখন মাটি ও গাছের কাঠামোর অভ্যন্তরে থাকা অণুজীব (micro organisms), মূলত কিছু বিশেষ ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক, এই ক্যালসিয়াম অক্সালেট স্ফটিকগুলিকে ভেঙে দিয়ে আরও স্থিতিশীল খনিজ, 'ক্যালসিয়াম কার্বনেট' বা চুনাপাথরের মতো পদার্থ তৈরি করে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, এগুলো শুধু গাছের বাইরের দিকে নয়, বরং কাণ্ডের ভেতরের অংশেও জমা হচ্ছে। এই খনিজ কার্বন জৈব কার্বনের চেয়ে অনেক বেশি স্থিতিশীল এবং হাজার হাজার বছর ধরে অক্ষত থাকতে পারে। ফলস্বরূপ, এই প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলের কার্বন আরও বেশি স্থায়ীভাবে আবদ্ধ হচ্ছে, যা একেবারে অপ্রত্যাশিত সুখবর।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় এই আবিষ্কার এক বড় আশার আলো দেখাচ্ছে। কারণ কার্বন মজুদকরণের এই পদ্ধতি অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী। সাধারণ গাছপালার কাঠে যে কার্বন জমা থাকে, তা পচে বা পুড়ে

গিয়ে কয়েক দশক বা শতাব্দীর মধ্যে আবার পরিবেশে ফিরে আসতে পারে। কিন্তু এই বিশেষ প্রজাতির Ficus গাছের তৈরি ক্যালসিয়াম কার্বনেট হাজার হাজার বছর ধরে মাটিতে বা পাথরের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে, ফলে কার্বন মুক্তির ঝুঁকি প্রায় নেই বললেই চলে।

সর্বোপরি, যে তিন প্রজাতির Ficus গাছ নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে সেগুলি ফল বহনকারী গাছ (fruit-bearing species), যার অন্যতম হলো Ficus wakefieldii অর্থাৎ, এই গাছগুলি বনায়ন (forestry) এবং ফল চাষ (agroforestry) উভয়ের জন্যই ব্যবহার করা যেতে পারে, যা খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি বায়ুমণ্ডলের কার্বন নিয়ন্ত্রণ করার মতো অতিরিক্ত সুবিধাও দেবে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই প্রক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম কার্বনেট গঠনের ফলে আশেপাশের মাটির অম্লতা (acidity) হ্রাস পায় এবং ক্ষারত্ব (alkalinity) বাড়ে, যা মাটির স্বাস্থ্য উন্নত করে এবং গাছপালার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি-উপাদানকে সহজলভ্য করে তোলে। গবেষক মাইক রোলি মন্তব্য করেছেন, যদি আমরা ফল উৎপাদন এবং জৈব কার্বন সংরক্ষণের জন্য গাছ লাগাই, তবে Ficus wakefieldii গাছের মতো প্রজাতি নির্বাচন করা যেতে পারে, যারা বেশি মাত্রায় খনিজ কার্বন মজুদকরণের সুবিধা দেবে। এখন বিজ্ঞানীরা এই প্রক্রিয়াটিকে আরও ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করছেন এবং দেখছেন বিভিন্ন পরিবেশে এই প্রজাতির গাছগুলি ঠিক কতটা ভালোভাবে এই কার্বন জমা করতে পারে। নিঃসন্দেহে আশা করা যায় বিশ্বব্যাপী কার্বন নিঃসরণ (carbon emissions) হ্রাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক সুযোগ হয়ে উঠবে।

তথ্যসূত্র :

https//www.preprints.org/manuscript/202510.1451
https//www.geo.uzh.ch/en/news/papers/2025/fig-tree-co2s.c.html
https//phys.org/news/2025 07-fig-trees-atmospheric-stone-reveals.html

তিয়াষা বিশ্বাস
সিক্সথ সেমিস্টার (সাইকোলজি, মেজর)

সুপর্ণা রায়

সেমিস্টার-৫ (ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট)

প্রিয়া দাস

সেমিস্টার-৫ (সংস্কৃত ডিপার্টমেন্ট)

দেবাঞ্জনা চ্যাটার্জী
সেমিস্টার-১ (ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট)

চরৈবেতি

সুভদ্রা চ্যাটার্জি
(প্রাক্তনী)

ঠিস্ ঠিসুম্। আওয়াজটা কানে যাওয়ার সঙ্গে একটা তপ্ত অগ্নি শলাকা যেন প্রবেশ করল আমার পায়ের কাছে। আওয়াজে ভয় পেয়ে একদল কাক কা কা খা খা করে ডানা মেলল দুপুর আকাশের সবটুকু নীরবতা ভঙ্গ করে। পিছন থেকে কে যেন ডাক দিল; 'মাসিমা, মাসিমা, দিদা ও দিদা!' চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি, হাতে পতাকা নিয়ে ছুটে আসছে মেয়েরা। আমাকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিলে ওরা। বসতে বলল। আমি বললাম, 'না। আমাকে যে লক্ষ্যের পথে এগোতে হবে। বসলে আমার চলবে কি করে!' তবু ওরা থামালো আমাকে। সত্যি। এগোনোর পথে কত বাধা! ভালোবাসার ডাক উপেক্ষা করে এগোনোও যায় না। তাই থামতে হলো। ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে নিচের দিকে তাকাতেই চোখে পড়লো মেয়েগুলো আমার পায়ের কাছে বসে আছে। নিজেদের শাড়ির পাড় ছিঁড়ে কী যেন করছে, চেয়ে দেখি, আমিই রক্তাক্ত। চোখে পড়লো আমার কাপড়ের পাড়ের কাটা লাল হয়ে গেছে। লাল টকটকে! ঐ মাধবীলতার মতো লাল! যে লাল আমি কবেই বিদায় করে বসে আছি আমার সিঁথি থেকে, অঙ্গ থেকে, কাপড় থেকে। বয়স এক কুড়ি হবার বছর দুই আগেই হবে। সেই লাল আজ এই সন্ধ্যায় আবার বুঝি ফিরিয়ে দিলো আমার দেশের মাটি।

লক্ষ্য করে দেখছি, এগিয়ে যাওয়াই অতীতকে ভুলে থাকার পথ। থেমে গেলেই পায়ে পায়ে জড়ানো শ্যাওলার মতো ছেঁকে ধরে অতীতের পাতা। মনে পড়ে শৈশবের কথা, কৈশোরের ক্ষণিকের বৌ-বৌ খেলার স্মৃতি। তারপর আবার সাদা সিঁথিতে পুরনো মাইতি বাড়িতে, হারিয়ে যাওয়া মেয়েটির নব প্রবেশ। এখন আর সে মাইতি বাড়ির মেয়েও নয়, হাজরা। মনে পড়ে সবার টিটকিরি, কোঁচকানো কপাল, রুষ্ট হাবভাব। এ মেয়ে কেমন যেন শান্তশিষ্ট মেয়েটি আর নয়। বিধাতা যার রক্তের আগুনে ভাগ্যকে জ্বালিয়ে বজ্র তৈরি করতে চেয়েছেন, সে মেয়ে কেমন করে শান্ত হবে!

আমি শান্তি খুঁজিনি। প্রবল পরোপকারের ডাক আমায় উড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। এ পাড়া থেকে ও পাড়া, এ গ্রাম থেকে সে গ্রাম। লোকের ব্যথা বুঝেছি। হেসেছি। তার বুকে মাথা রেখে কেঁদেছি আমার ভিতরে। ধীরে ধীরে আমি একাকী আলোর শিখার সন্ধান পেয়েছি। অশ্রুসজল আঁধার পথে আলোয় ভরা পথ দেখানো সেই দীপশিখাটির নাম 'বাপু'। আমাদের গ্রামে যে দু একজন অবাঙালি পথিক আর অতিথির যাতায়াত ছিল তারা তাঁকে বলতেন 'গানহি বাবা'। হ্যাঁ, তিনিই। তিনিই আমার অন্ধকার চোখে দেশপ্রেমের কাজল রেখা এঁকে দিয়েছিলেন। তাঁকে তখন সামনে থেকে দেখিনি। দূরের ধ্বনি হয়ে তিনি আমাকে পথ দেখিয়ে গেছেন।

বড় সময় লাগাচ্ছে মেয়েগুলো। পায়ে একটা গুলি লেগেছে বই তো নয়। তার জন্য এতটা সময় নষ্ট করলে চলে! আমার এ পা অনেক কাঁটা বিছানো পথে চলার সাক্ষী আছে রে বাবা। পুলিশের লাঠিও তো কিছু কম পড়েনি। তখন আমার মধ্যবয়স। কতো হবে! চৌত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ বোধহয়। ১৯০৫ সাল সেটা। সেইসময় ওরা, আমাদের সোনার বাংলাকে ভাগ করার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে ফেললেন। আমার রক্তে আগুন জ্বলে উঠলো,

ঝাঁপিয়ে পড়লাম আন্দোলনে। গলায় গানও ছিল রবিবাবুর লেখা গান, 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান।' আহা! গান নয়তো, সে যেন মহামন্ত্র। তখন থেকেই সবাই আমাকে একটা নাম দিয়েছিল। আমার আত্মায় অহংকারে চেতনায় সেই নাম, জড়িয়ে গিয়েছিল গান্ধীবুড়ি! গান্ধীবুড়ি! হ্যাঁ, বঙ্গ দেশে মেয়েরা কুড়ি পেরোলেই তো বুড়ি। আমি তো পঁয়ত্রিশ বছরে বুড়ি হয়েছিলাম, তাতে আর অবাক হওয়ার কী আছে!

যাক। মেয়েদের বাঁধাছাঁদা শেষ হলো। একজন বললো, 'তুমি কি ফিরে যাবে দিদা? অনেক রক্তপাত হয়েছে।' আমি বললাম, 'দেশের পতাকা হাতে এগোও সব। আমি সামনে আছি।'

আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি হতে চললো বোধহয়। ঝকঝক করছে সোনালি রোদ। পুকুর পাড়ে হাঁস পালক ঝাড়ছে, শিউলিতলা বিছিয়ে আছে ফুলে। দূরে দূরে কাশের বনে শরতের হাওয়া দোলা দিয়ে প্রকৃতি মাকে যেন চামর দিয়ে হাওয়া করছে। কী সুন্দর মন ভোলানো রূপ আমার মায়ের, আমার দেশের! এই অপরূপা দেশমাকে কী করে ঐ মেলেচ্ছগুলোর পায়ের তলায় পিষতে দেখব! না। এ জীবন থাকতে তা হতে দেবো না। হতে দিতে পারি না। যদি তেমন নিষ্ক্রিয়ই হতাম, তাহলে এতদিন ধরে এত কষ্ট করলাম কেন? কমবার জেলে গিয়েছি! যা গেছে! কী অত্যাচার, সেখানকার খাওয়া, কী ভীষণ কষ্ট সেখানকার থাকায়! তবু কি ক্ষণিকের জন্যও টুঁ শব্দটি বার করেছি! করি নি তো!

ঠিস্ ঠিসুম্। আহহ্! ডান হাতে আবার কী যেন এসে লাগলো! এ দেখো, হাতে ধরা শাঁখখানি মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে, ভাঙেনি। মা বলতেন, শাখা ভাঙলে অমঙ্গল হয়। দেশের, দশের অমঙ্গলের ভয়ে এখনো আমি কাঁটা। আবার মেয়েরা ছুটে এসেছে। ছেলেদের পায়ের শব্দ শুনছি যেন! ভীষণ গোলমাল লেগে গেছে চারিদিকে। সবার মুখে এক কথা, তুমি ফিরে যাও দিদা। আরে, ফেরার জন্য কি আজ আমি বেরিয়েছি! গান্ধীবুড়ি কি মরতে ভয় পায়! তার পায়ে সর্ষে, হাতে চরখা! মাথার উপর ভারতমাতা, চোখের সামনে গানহি বাবা।

লালমুখো ইংরেজ পুলিশ লাঠির ঘা মারতে মারতে কি যেন বলে চলেছে। ছেলের দল তাদের সঙ্গে কথা বলছে। একশো চুয়াল্লিশ ধারা, না কি যেন জারি বলছে বোধহয়। তা করগে যা, আমি ছ'হাজার সঙ্গী নিয়ে এসেছি। সে কি তোদের মুখের কথায় চম্পট দেবার জন্য! আমি যখন থাকবো না, আমার সঙ্গী সাথী কেউ থাকবে না, তখনও এই মুহূর্তগুলি লোকের মুখে মুখে বেঁচে থাকবে। ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের পথিক আমরা, ভারত থেকে ইংরেজ রাজত্ব বিদায় করেই ছাড়বো।

হাতটায় বেশ ব্যথা করছে। মাথাটা ঘুরছে। রোদে তেতে কিনা জানি না! তবু থামলে চলবে না। আজ ঠিক করেছি তমলুক, মহিষাদল, সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম; সবকটা থানা দখল করবো। শুধু থানা নয়, থানা আর সরকারি অফিস যত আছে সব। সবার মাথায় আমার দেশের পতাকা উঠবে। ছেলে মেয়েদের বলেছি, টেলিফোন আর টেলিগ্রাফের তার কেটে দিতে। মেদিনীপুরের সব রাস্তার বড় বড় গাছ কেটে ফেলতে হবে। পিছিয়ে কেন যাব! সামনে তো নতুন চলার পথ। শুধু মানুষের মাথা! শুধু মানুষ আর মানুষ। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি না, সব আবছা দেখছি। চোখে কি কিছু হলো? বয়স তো কম হলো না! সত্তর পেরিয়েছি তিন বছর আগেই।

কাকের দল চিৎকার করছে। এতো মানুষ ওরা একসঙ্গে সহ্য করতে পারে না! ইংরেজের গুলির শব্দ ওদেরও বুকে বেঁধে। আমাদের মতো ওরাও দেশের যে! কোথায় কেউ যেন হল্ট হল্ট করে চেঁচাচ্ছে, হল্ট মানে,

থামো। তোরা এবার থাম দেখি! সাত সমুদ্র পেরিয়ে নিজের দেশে ফের! আমাদের দেশে আমাদের থাকতে দে। গলা চিরে আচমকাই বেরিয়ে এল কটা শব্দ- ইংরেজ, ভারত ছাড়ো! করেঙ্গে, ইয়া মরেঙ্গে। আজ অবধি কতোবার তো উচ্চারণ করেছি এই কথাগুলো। তবে আজ কেন যে কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে চোখের কোণে জল আসে! ও ভগবান, আমায় দুর্বল কোরো না! আমি তমলুকের কন্যা, আমি বাংলার কন্যা, আমি মেদিনীপুরের কন্যা। দুর্বল হওয়া যে আমার সাজে না।

সাজে না বটে, কিন্তু বড় দুর্বল লাগছে আজ। পা টেনে চলতে পারি না, হাত তুলতে পারছি নে। বাঁ-হাতে ধরা দেশের পতাকা। সে হাতখানিও যেন থরথর করছে। কেন করছে জানি নে! ও হাতে তো গুলি লাগে নি। মুঠোটা একটু শক্ত করে রাখি। পতাকা যেন পড়ে না যায়। আমার দেশের পতাকা। দেশের সবলা মেয়ে যেন তার মান রাখতে পারে। কিন্তু বড় দুর্বল লাগছে সত্যি। যেবার বহরমপুর জেলে ছিলাম, সেবার এমন দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। বাড়ি ফেরার পর মা বলেছিল, 'মাতু, এমন রোগা, দুর্বল হলি কি করে?' আমি হেসেছিলাম। বলেছিলাম, 'ও ব্যাটারা, রোজ বহরমপুরের ছানাবড়া খেতে দিত কিনা, তাই খেয়েই দুর্বল হয়েছি। বড় বেশি খাওয়া হয়ে গেছে মা!'

'মা', কত ছোট করে বলা, কত বড় একটা কথা! মা কে বড় মনে পড়ছে, বাবাকেও। দেশমায়ের সেবা করতে করতে নিজের গর্ভধারিণী মাকে কি একটু অবহেলাই করেছি? সেই পাপেই কি আমায় 'মা' বলে ডাকার কাউকে দিলো না ভগবান? গান্ধীবুড়ি, মাসি, দিদা, দিদিমা, ঠাকুমা; কতই না শুনলাম! কিন্তু মা ডাক কেউ ডাকলো না। না ডাকুক গে! আমিই ডাকবো। বন্দেএএএ মাতরম্। বন্দেএএএ মাতরম্। সমুদ্রের ঢেউয়ের গর্জনের মতো কলরব উঠলো, 'বন্দেমাতরম্!' ক্ষেপে উঠছে ছেলেরা, ক্ষেপে উঠছে মেয়েরা। ক্ষেপে উঠছে দেশের লোক। আছড়ে পড়তে চাইছে ইংরেজের শাসনযন্ত্রের মূল জীয়ন কাঠির উপরে। এগিয়ে চল। এগিয়ে চল। চরৈবেতি।

কোথা থেকে একটা কঠিন আগুনের ছোট্ট গোলা ছুটে এলো আমার কপাল লক্ষ করে। আমি টলে যাচ্ছি। চলে যাচ্ছি। থামবো না। তোমরাও থেমো না। এগিয়ে চল। এগিয়ে চল হোগলাগ্রাম, এগিয়ে চল মেদিনীপুর, এগিয়ে চল বাংলা, এগিয়ে চল ভারত, এগিয়ে চল ভারতবাসী। স্বাধীনতার লক্ষ্যে স্থির থেকো, অনড় থেকো, এগিয়ে চল। এই দেখো, আমার হাতের পতাকাটিকে আমি পড়তে দিই নি। নত হতে দিই নি। এই পতাকা হাতে ধরো, আমি চললাম। কোথাও কে যেন চিৎকার করে বলছে, 'মাতঙ্গিনী হাজরা পড়ে গেছেন!' তোমরা থেমো না। আমি চলতে চাইছি, কিন্তু পারছি না। তোমরা থেমো না। এগিয়ে চল। আজ একজন মাতঙ্গিনী বিদায় নেবে, লক্ষ মাতঙ্গিনী জেগে উঠবে। উঠবেই। সামনে যে নতুন সকালের আলো দেখতে পাচ্ছি আমি! স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমার হাতে ধরা এই পতাকাকে প্রতিটি আপিসে, দপ্তরে, ছাদের মাথায় উড়তে দেখতে পাচ্ছি। তোমরা শুধু এগিয়ে গিয়ে সে পতাকাকে তুলে ধরো। এগিয়ে যাও। জয় ভারত মাতা। বন্দে মাতরম্! বন্দে মাতরম্! বন্দে এএএএ...

আমার দৃষ্টিতে রামায়ণী কথার কিঞ্চিৎ অকিঞ্চিৎ কথা

অপরূপা চ্যাটার্জি
(প্রাক্তনী)

মনুতে বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ যেমন পরম বিদ্বান্ হয়ে থাকেন, ক্ষত্রিয়ের উচিত তেমন বিদ্বান্ ও সুশিক্ষিত হয়ে ন্যায়ানুসারে রাজ্য রক্ষা করা।

রাজধর্ম অর্থাৎ রাজার ধর্ম অর্থাৎ কর্তব্য, একজন রাজার পালনীয় কর্তব্য প্রজা পালন, প্রজারঞ্জন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করা। প্রকৃত পক্ষে 'রামরাজ্য' বলতেই আমরা সুশাসনের অধীন এক সত্য ও ন্যায়ের শাসন বুঝে থাকি, মূলত রাজধর্মের কর্তব্যের খাতিরে, বলতে পারা যায় সিংহাসন রক্ষার তাগিদই তাঁদের মূল লক্ষ্য।

রামায়ণে প্রথম দিকে আমরা রঘুপতিকে দেখি তিনি সব দিক থেকে সীতাকে রক্ষা করছেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর চরিত্রে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রথম দিকে তাঁকে 'নরচন্দ্রমা' বলে বিশেষিত করা হচ্ছে। তখন তিনি ক্ষাত্রধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করছেন। সেই আদর্শেই রাক্ষসদের উপদ্রব থেকে ঋষিদের আশ্রম রক্ষা করেন।

আবার চতুর্বর্ণের বাধা কাটিয়ে প্রজাহিতৈষী হয়ে সর্বজাতি ও বর্ণের কল্যাণকে প্রাধান্য দিয়ে নিষাদ গুহকের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করেন। ''সর্বে প্রজা মম সন্তান'' এই ভাব তাঁর আচরণে লক্ষিত হয়।

অন্যদিকে রাজধর্মের পালন হেতু যে সীতাকে রাম সর্বতো ভাবে রক্ষা করতেন, তাঁর অনুরোধ রক্ষা করতেন, সেই রাম রাজধর্ম পালনের জন্য বিনা অপরাধে সীতাকে পরিত্যাগ করেন। রামায়ণের সূচনা পর্বে যে রাম-সীতাকে আমরা দেখতে পাই, যে সমাজ-বিপ্লবের আভাস পাই, পরবর্তী উত্তর-কান্ডে তা' মুছে দিয়ে রাম ও সীতার জীবনকে রাজধর্মের আদর্শ ও সমাজের আচার রক্ষার অনুকূল করে চিত্রিত করা হয়েছে।

আমার মতে রাজধর্ম রক্ষার সঙ্গে রামের স্বার্থ জড়িত। সেই সিংহাসন রক্ষার্থে চিরাচরিত আপোস-রফা। স্ত্রী সীতার মান রাখতে গেলে প্রজাহিতৈষণা আঘাত পায়। বনবাসকালে যে-রাম 'সীতা বিনা' নিজেকে 'মণিহারা ফণী' বলে আক্ষেপ করতেন, সিংহাসনারূঢ় হয়ে সেই সীতাকে রাক্ষসস্পর্শে কলুষিত বলে চিহ্নিত করতে তাঁর বাধে না। কারণ বনবাসকালে তখন তাঁর কাছে সিংহাসন ছিল না। রাজধর্ম রক্ষার তাগিদও ছিল না। কিন্তু সিংহাসনারূঢ় হয়ে সীতাকে গ্রহণ করলে সিংহাসন রাখতে পারতেন না। অতএব রাজধর্মে রাজার স্বার্থই প্রধান। ব্যক্তি রামচন্দ্র তখন নিজ স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছেন।

রামায়ণে বলা হয়েছে রাজা পিতা, মাতা। রাজাই সকলের হিতকারী। সৎ-অসৎ কার্য নির্ণয়কারী। রাজা যদি এ সংসারে না থাকতেন তাহলে এই সংসার অন্ধকারে ঢেকে যেত। সৎ বা অসৎ কিছুই জানা যেত না—

''রাজা মাতাপিতাচৈব রাজা হিতকরো নৃণাম্।।
অহো তম ইবেদ্যংস্যান্ন প্রজ্ঞায়েত কিঞ্চন।
রাজা চেন্ন ভবেল্লোকে বিভজন্ সাধ্বসাধুনী।

অতএব রাজা সমাজের রক্ষক, রাজধর্ম সমাজ রক্ষা করা। এবং তা করতে গিয়ে দারাপুত্র পরিবার কারো স্বার্থ বড়ো নয়।

রাজ্য সুরক্ষিত ও বিস্তৃত করে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রজাহিতৈষণ-মনোভাব খুব প্রয়োজন, রাজ্যের স্বার্থেই তখন অসাম্প্রদায়িক ও পরধর্মসহিষ্ণু হতে হয়। খানিক অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও বলতে ইচ্ছে করছে, আমরা রাজধর্ম রক্ষায় সাম্রাজ্য বিস্তারে প্রজাহিতৈষণাকে গুরুত্ব দিতে দেখি, ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে সম্রাট অশোক সহ অন্যান্য সম্রাটগণ এবং সাম্প্রতিক অতীত বা মধ্যযুগের ইতিহাস লক্ষ্য করলে তার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে মুঘল-সম্রাট আকবরকে প্রজাহিতৈষী সর্বধর্মসহিষ্ণু সম্রাট হিসেবে ইতিহাসের পাতায় দেখি। যাঁর মূল লক্ষ্য ছিল সুদৃঢ় রাজধর্মের প্রতিষ্ঠা এবং তার যথাযথ, ন্যায়-সঙ্গত প্রয়োগ। পরবর্তীকালে আর কোনো সম্রাটের মধ্যে তার প্রমাণ খুব বেশি পাই না। ফলস্বরূপ সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁরা যে খুব সুফল পেয়েছিলেন তা কিন্তু নয়। অতএব রামরাজ্য বিস্তারে সিংহাসন রক্ষায় স্বয়ং রামও তার ব্যতিক্রমী হতে পারেন না, পারেনও নি।

রামায়ণে রাজধর্ম

'রাজধর্ম' কথাটি সংস্কৃত শব্দ। রাজার প্রজাদের প্রতি ন্যায়ের ধারণা, সঠিক বিচার ব্যবস্থার বিন্যাস, প্রজাদের প্রতি আইনানুগ দেশশাসন, রাজার কর্তব্য, দায়িত্ব প্রভৃতি বোঝায়।

রাজধর্ম সম্বন্ধে মনু ঋষিদের বলেছেন —

রাজধর্মান্ প্রবক্ষ্যামিযথাবৃত্তো ভবেনৃপ।।
সম্ভবশ্চয়খাতস্য সিদ্ধিশ্চ পরমাযথা।।১।।
ব্রাহ্মণং প্রাপ্তেন সংস্কারং ক্ষত্রিয়েনাযথাবিধি।।২।।
সর্বস্যাস্যমযথান্যায়ং কর্তব্যং পরিবক্ষণম্।।

রাজধর্ম সম্বন্ধে মনু বলেন —

রাজার যেরূপ হওয়া উচিত সেরূপ যাতে হওয়া সম্ভব হয়, যাতে তার পরম সিদ্ধি লাভ হতে পারে, তা হ'ল — ব্রাহ্মণ যেমন পরম বিদ্বান্ হয়ে থাকেন, ক্ষত্রিয়ের উচিত তেমন বিদ্বান্ ও সুশিক্ষিত হয়ে ন্যায়ানুসারে রাজ্য রক্ষা করবেন।

রাজা ও অমাত্যদের নিয়ে রাজদরবার। বাকি সবাই প্রজা। তারা চার বর্ণে বিভক্ত। অযোধ্যা নগরীর বর্ণনা দেবার সময় বলা হয়েছে, যেখানে ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণদের আজ্ঞাবহ, বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয়ের আজ্ঞাবহ, শূদ্রগণ উপরোক্ত তিন বর্ণের সেবায় নিযুক্ত। বনবাসকালে রাম ভরতকে অযোধ্যার অবস্থা জানার জন্য যে সব প্রশ্ন করেছিলেন, তার মধ্যে একটি ছিল, ব্রাহ্মাণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ অযোধ্যায় স্বকর্মে নিরত আছেন তো?

রামায়ণে চতুর্বর্ণের মধ্য ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। 'দ্বিজ' বা 'দ্বিজাতি' বলতে কেবল ব্রাহ্মণদেরই নির্দেশ করা হয়েছে। বেদে ক্ষত্রিয়দের নির্দেশ করে 'রাজন্য' শব্দ ব্যবহৃত হলেও রামায়ণে 'রাজন্য' শব্দ উল্লিখিত নেই।

রামায়ণের শিক্ষা

'নাবিদ্বান্ বিদ্যতে কচিৎ।' রামায়ণের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদ জানা না গেলেও অযোধ্যা নগরীর বর্ণনায় বলা হয়েছে, সেখানে বেদাদিতে অতি অল্প জ্ঞানবান্ ও অবিদ্বান্ একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন না।

এক্ষেত্রে বলা চলে, রামায়ণ মহাকাব্যটিই এক মহান শিক্ষক। ভালো-মন্দ, ন্যায় -অন্যায়, উচিত-অনুচিত বোধ তৈরি করে দেয়। বৃহত্তর জীবনে কীভাবে মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে সেই মানবিক শিক্ষা রামায়ণ দান করে। সে কারণেও 'রামায়ণ'-এর নায়ক 'রাম' ভারতীয় সমাজ শিক্ষায় 'রামচন্দ্র' হয়ে উঠতে পেরেছেন। নতুবা তা সম্ভব হতো না।

সেকালের বিভেদসৃষ্টিকারী, শুধু সেকালের কেন, সর্বকালের বিভেদসৃষ্টিকারী বর্ণভেদ প্রথার অস্পৃশ্যতার শিক্ষায় রামচন্দ্রের বিশ্বাস ছিল না। সে কারণেই নিষাদ গুহক তাঁর পরম মিত্র হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। মনুষ্যেতর বানরদের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা এত দূর পর্যন্ত ছিল যে, সীতা উদ্ধারে শেষ পর্যন্ত তারা রামকে সাহায্য করেছে। এমন কি অনার্য রাক্ষসাধিপতি রাবণের অনুজ বিভীষণ তাঁর বন্ধু হয়ে অগ্রজ রাবণের বিরোধিতা পর্যন্ত করে সীতা উদ্ধারে সহায় হন। যদিও সমগ্র পৃথিবী বিভীষণকে 'ঘরভেদী বিভীষণ' হিসাবে চিহ্নিত করেছে, তবু অনার্য রাক্ষসরাজানুজ বিভীষণের রামের মিত্র হওয়া, রামের উদার মনোভাব, অস্পৃশ্যতা ও বর্ণাশ্রম বিরোধী মনোভাবের পরিচায়ক।

এক্ষেত্রে আরো পরবর্তী কালে আধুনিক যুগে বিবেকানন্দের 'শূদ্র জাগরণ'-এর কথা মনে আসে। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, শূদ্র জাতিই সমাজের স্তম্ভ স্বরূপ। ''যাহাদের শারীরিক পরিশ্রমে ব্রাহ্মণের আধিপত্য, ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য ও বৈশ্যের ধনধান্য.....'' তারাই জাতির ধারক ও বাহক, তাদের যথাযোগ্য মর্যাদা না দিলে জাতির অগ্রগতির ধারা ব্যাহত হয়।

রামায়ণ-মহাকাব্যের নায়ক রামের জীবনে প্রথমে সাংসারিক কারণে এসেছে অরণ্যযাত্রা পরে ধর্মপত্নী সীতা উদ্ধারের জন্য এসেছে যুদ্ধ। আর বনবাস ও যুদ্ধকে কেন্দ্র করে মহাকাব্যের প্রতিটি কথাপুরুষের জীবনে সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা হর্ষ চক্রাকারে আবর্তিত হয়েছে। কথাপুরুষগণের প্রায় প্রত্যেককেই বাস্তব জীবনের বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়েছে নানা কারণে। তবু প্রতিটি ব্যক্তিই আপন স্বভাববৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল, সেটিই রামায়ণের অনন্য শিক্ষা, প্রতিকূলতাকে জয় করা।

রামায়ণে দেখেছি যখনই রামের কোনো সিদ্ধান্ত লক্ষ্মণের, ভরতের কোনো সিদ্ধান্ত রামের পরিস্থিতির প্রতিকূল মনে হয়েছে তৎক্ষণাৎ একে অপরকে জানাতে দ্বিধাবোধ করেন নি। যেমন ঃ রামের বনবাস যাত্রার আগে তাঁর উদ্দেশ্যে লক্ষ্মণ বলেছেন—

''বিক্লবো বীর্যহীনো যঃ স দৈবমনুবর্ততে।
বীরাঃ সম্ভাবিতাত্মানো ন দৈবং পর্যুপাসতে।।

যে ব্যক্তি অতিশয় কাতর ও দুর্বল, সেই ব্যক্তিই দৈবকে অনুসরণ করে। যাঁরা বীর ও সংসারে পুরুষ বলে গণ্য তাঁরা দৈবের অনুসরণ করেন না। এ যেন সেই ছোটোবেলায় সূক্তিরত্নাবলীতে পড়া—

''উদ্যোগিনঃ পুরুষ সিংহমুপৈতি লক্ষ্মী।
ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিষ্যন্তি মুখে মৃগাঃ।।

রামের উদ্দেশ্যে লক্ষ্মণের এই বক্তব্য সংসারে দৈবনির্ভর মানুষের মনে পুরুষকার উদ্ভাবনের সহায়ক।

আবার বনযাত্রার আগে সীতাকে অযোধায় রেখে যাবেন যখন মনস্থ করেছিলেন তখন সীতাকে নানা উপদেশের সঙ্গে বলেছেন যে,

''ঋদ্ধিযুক্তা হি পুরুষা ন সহন্তে পরস্তবম্।

তস্মান্ তে গুণাঃ কথ্যা ভরতস্যাগ্রতো মম।

অর্থাৎ সীতা, তুমি ভরতের নিকট আমার গুণগান করবে না, কারণ ঐশ্বর্যযুক্ত ব্যক্তি অপরের গুণগান পছন্দ করে না — মানুষের ব্যবহারিক জীবনে রামের এই বাক্য শিক্ষণীয়।

বিভীষণ রামের পক্ষে যোগ দিলে ইন্দ্রজিতের সেই বিখ্যাত উক্তি যা তিনি অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে খুল্লতাত বিভীষণকে বলেছিলেন, মধুসূদন তাঁর 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে তা' অমর করে রেখে গেছেন —

গুণবান্ বা পরজনঃ স্বজনো নির্গুনোহপি বা।

নির্গুণঃ স্বজনঃ শ্রেয়ান্ যঃ পরঃ পর এব সঃ।।

অর্থাৎ গুণবান্ শত্রু এবং নির্গুণ স্বজন হলেও গুণহীন স্বজনই শ্রেষ্ঠ। কারণ যে শত্রু সে চিরদিন শত্রুই থাকে, কখনো আপন হয় না— রামায়ণের ইন্দ্রজিতের এই কথাও সেই শিক্ষাই দেয়। আরেক ভাবে বললে বলা যায় —

''দুর্জনঃ পরিহর্তব্যো বিদ্যয়ালংকৃতোহপিসন্

মণিনাভূষিতা সর্পাঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ।।''—

এভাবে রামায়ণের কালে ''নাবিদ্বান্ বিদ্যতে কচিৎ'' যেমন সে সময়ের শিক্ষার দলিল, তেমনি সমগ্র রামায়ণ মহাকাব্যটি নিজেই এক শিক্ষক স্বরূপ। শোক, তাপ, ব্যাধি, শত্রুতা, প্রতিকূলতা, আনন্দ, বেদনা প্রভৃতি বিবিধ মানসিক ও জাগতিক প্রতিকূলতাকে জয় করে মাথা উঁচু করে থাকার শিক্ষা দেয়। রাম-কাহিনীর প্রতিটি চরিত্র আজও ভারতবর্ষ ও আর্ন্তরাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও বৈরাগ্য, ভালোবাসা, নৈতিকতা ও একই সঙ্গে বীরত্বের আদর্শের শিক্ষা দেয়।

অজস্র ধন্যবাদ

সুভদ্রা চট্টোপাধ্যায়
(প্রাক্তনী)

অজস্র ধন্যবাদ
হেমন্ত শিশির,
অজস্র ধন্যবাদ
পর্ণমোচী আলো,
অজস্র ধন্যবাদ
বিধাতাপুরুষ,
এতোজন প্রশ্নাতীত
বয়ে যায় ভালো।

শুনেছি যে
অন্তরেতে অবক্ষয়
আজ,
স্বার্থপর এ পৃথিবী,
শুধু দেয়া- নেয়া,
শুনেছি যে
ভালোবাসা, শ্রদ্ধা আর
স্নেহ,
মৃত নক্ষত্রের মতো
চকিতে মিলায়।

কিছু হারায় নাতো,
মেঘের আড়ালে,
তারারা লুকিয়ে ঢালে
জ্যোৎস্নার আলো,
দূষণে দূষিত বায়ু
ফুলে সুরভিত,
অন্ধকার রাতও জ্বালে
বিবেকের আলো।

অজস্র ধন্যবাদ
সুপ্ত অনুভূতি,
অজস্র ধন্যবাদ
নবান্নের ঘ্রাণ,
অজস্র ধন্যবাদ
শুদ্ধ আত্মদীপ,
মানুষের মনে আজ
পেয়েছি যে স্থান।।

From Nervousness to New Confidence: My NSS Story

Aristha Mondal
Sem-1, B.Sc Psychology Honours, NSS Unit Member,
Victoria Institution (College)

"Do they even have common sense?"

The words came out harsh, almost cruel. I was standing inside a café, furious, accusing the staff of being irresponsible, dangerous, and shameless. My voice was loud and my expressions full of anger. For a moment, it felt real, too real.

Then I remembered, I was not actually a customer. I was a college fresher. And this was my first NSS street play.

The play was about HIV awareness, and I was playing the role of an angry customer who had just discovered that the café staff was HIV positive. In the story, fear quickly turned into hatred. The customers cancelled orders, hurled insults, and walked out, convinced that mere contact would infect them.

As I acted, something unexpected happened. I stopped "acting". I slipped completely into the character. The anger, the disgust, the prejudice came naturally. And when I looked around, I saw the audience. Some people stared silently. Some looked uncomfortable. A few exchanged glances. That was when I realized something unsettling; this mindset was not fictional. It existed in the real world.

When the social workers entered the scene and explained the truth about HIV, how it does not spread through touch or food, how people living with HIV deserve dignity and acceptance, the mood slowly changed. The noise softened. Faces grew thoughtful. In that moment, I understood how powerful awareness can be when it is shown, not preached.

That street corner changed me. NSS was no longer just an activity. It became an experience that stayed with me.

After that, my journey continued in quieter but equally meaningful ways. At a free

health check-up camp in our college, I found myself guiding people, calming nervous faces, helping them stand in line for tests. It was not dramatic, but it mattered. *Small help, real impact*.

Another day, I was walking under the sun with students from different colleges, shouting slogans to protect wildlife. During that programme, I learned a lesson I will not forget. I and another friend, both freshers, went to buy food on our own. Our teacher gently stopped us and reminded us that NSS is about “unity, not individuality”. “If one eats, all eat. If one asks, all share. No one is bigger, no one is smaller”. That simple moment taught me the true meaning of being part of a group.

I also witnessed the importance of early awareness during a Thalassemia screening camp, where silence and seriousness spoke louder than words. Behind every step, our NSS teachers stood quietly, encouraging us, correcting us, and believing in us even when we doubted ourselves. Once when I felt shy and hesitant, a teacher simply said, “You don't need to be perfect. You, just need to try.” That stayed with me.

Looking back, I realize NSS did not just teach me about society. It taught me about myself. It taught me empathy, courage, and the strength of standing together. Most importantly, it helped me to understand the meaning of the NSS motto---- *Not me, But You*

And that lesson, I know, will stay with me long after college.

The Quiet Return

Jyotika Das
Semester -5, Department of Mathematics

The alarm rang for the 5th time between 6 am to 9am. Mira stared at the ceiling. The fan was spinning in lazy circles above her. It was another day, another list of things to do, people to impress, goals to chase. She'd once loved mornings, the smell of fresh air and the morning walks. But lately everything felt like a burden to her.

She went through the motions: college, classes, and conversations that went on without meaning. Smiling when expected to, and laughing on cue. Somewhere between deadlines and expectations, she had misplaced something and that is "herself".

There were no big reasons. It was a slow fade just like the way sunlight leaves your skin after evening comes.

One afternoon after another with conversations that left her drained. One night after another that insomnia took over. She had been running on autopilot, grades, expectations, comparison, and guilt. She could not say a "no" to anyone, afraid of being left behind. She was trying hard to hold on to the things that were not meant to stay, but slip away.

One day after her class she just walked out without knowing where she was going. Her phone buzzed with messages, reminders, and plans. She put it on silent and slipped it into her bag. For the very first time in months she could hear only the sound of her footsteps.

She wandered until she reached the college ground, the one she used to visit in her first year when everything felt new and carefree. The wind blew the same way it used to be. She sat beneath the Ashoka tree and observed her natural surroundings. The smell of the Ashoka flower gradually seemed to calm her.

And there it was the quiet she had been missing. She had been searching for something outside that was within herself. She realized that in trying to become

someone worth noticing, she had forgotten to notice herself. She had measured her worth in validation from others and somewhere along the way her laughter had turned into a performance; her dreams into a checklist.

She was taking care of everything except herself. She was so busy to fit the environment that was not fit for her. She had forgotten that she is not here to fit in but to stand out. A soft breeze touched her hair and the sunlight gently caressed her face. She smiled. There was no applause, just her. Mira did not decide to change her identity that day. She simply decided to pause, to read, to draw, to write not because she had to but she wanted to.

She decided to say no when she meant no. She decided to forgive herself for not being perfect. And in those small honest moments she began to quietly return to the root everything that was herself. She started to show up for herself. She turned all her pain into fuel for her growth, smiling more, spending time by herself, counting her blessings and showing gratitude towards God and to believe in herself.

Then she realized that God had walked with her every step of the way.

Months later someone asked her, "What happened? You seem so much lighter".

She just smiled.

"I came home, to myself", she said softly.

A VISION FOR A MORE BEAUTIFUL AND PROGRESSIVE INDIA: STRENGTHENING THE FOUR PILLARS OF NATIONAL PROGRESS

Tabassum Khatoon
Semester 5, BA MDC (Morning)

A vision for a more beautiful and progressive India

India, our beloved nation is not just a piece of land marked on the map; it is a living soul that breathes through its rivers, dances in its festivals, and speaks through its countless languages. When we look at India from a broader perspective, we see not merely a country but a grand civilization; one that has endured invasions, revolutions, and reformations, yet continues to rise with courage and pride. It is this blend of resilience and beauty that makes India special and incomparable. But true beauty is not confined to scenic landscapes or ancient glories. The real beauty of a nation lies in its mutual harmony, disciplined citizens, educated youth, and strong ethical foundations. Today, India stands at the crossroads between tradition and modernity. While we have achieved tremendous growth in science, technology, and global presence, there still exist areas that call for reforms where small changes can lead to a profound transformation. If we wish to see India as one of the most respected and beautiful nations in the world, we must strengthen the four major pillars of progress: infrastructure, parenting, education, and law enforcement. Together, these can build a new India, cleaner, wiser, safer, and more compassionate.

Strengthening the foundation: Building better infrastructure

Infrastructure defines the face of a country. It speaks volumes about how a nation values progress, quality, and responsibility. India has made commendable strides in infrastructure– modern airports, highways, metros, and smart cities are steadily shaping the landscape of the country. Yet, if we move slightly away from these metropolitan marvels, we find areas where roads are worn out, drainage systems

are poor, and public spaces are neglected. Often, contractors use substandard materials to save costs, compromising the quality of construction. As a result, newly built roads develop potholes within months. The true tragedy is not only the inconvenience caused but also the attitude of acceptance that allows such practices to persist. India needs a strong mechanism of accountability. Every infrastructure project should undergo multiple levels of quality inspection. Independent panels of engineers and citizens' committees should be empowered to verify if projects adhere to declared standards. The government must enforce strict penalties on those found guilty of corrupt practices. Beyond construction quality, the aesthetic appearance of cities and towns also play an important role. Clean, green, and well-kept cities reflect a nation's discipline. Yet, in many areas, piles of garbage are seen lying in open spaces. Waste management should not be a temporary campaign but a permanent civic ethic. Municipal bodies must ensure that every building, residential or commercial, has access to proper disposal systems with waste segregation. To build a cleaner India, citizens too must recognize their role. Littering roads and public places should be seen not merely as an act of negligence but as a moral wrongdoing. Our ancient texts have long emphasized cleanliness as a form of devotion but today, it must be practiced as a responsibility. If every individual takes ownership of a clean home, clean street, and clean city, India will naturally evolve into a symbol of health and pride. Restoring the sacredness of our rivers is also critical. The Ganga and Yamuna were once the lifelines of purity, but industrial pollutants and domestic waste have turned sections of these rivers into toxic streams. Government initiatives like Namami Gange are steps toward revival, but success requires collective participation----people must reduce waste dumping, industries must follow strict filtration norms, and rural areas must be equipped with eco-friendly sewage systems.

The role of parenting in nation-building

Parenting is one of the most underrated yet powerful forces driving a nation's future. A society becomes great when its children grow into responsible, compassionate, and self-reliant adults. Indian family structure is strong, yet

parenting approaches often need reform. In many Indian families, children are overprotected. Parents, especially mothers, take on the full burden care, while children are often shielded from even basic responsibilities. Though this intention stems from love, it sometimes deprives children of valuable life skills. Independence, self-discipline, and problem-solving are not qualities learned suddenly in adulthood---they develop gradually through small daily tasks in childhood. We can learn valuable lessons from countries like Japan and South Korea, where independence training begins early. Children are encouraged to walk to school, organize their study space, prepare light meals, and manage personal hygiene from a young age. Such upbringing does not reduce parental care but it rather enhances it by empowering children to be capable and confident. India could adopt a structured framework to cultivate independence in children. For instance, between the ages of 5 and 16, children could be guided to manage their own rooms, make their beds, clean their study space, and prepare simple breakfasts. They can also be taught basic financial understanding through small allowances. These lessons, though simple, plant deep seeds of self-reliance. As they grow older, particularly between 17 and 23, society should encourage them to work in a café, helping as a receptionist, or freelancing in creative fields. The government can further encourage workers. Imagine a guideline that mandates that no part-time worker or student intern in India should earn less than 20,000 rupees per month. This would protect students from exploitation, provide stability, and encourage youth entrepreneurship. It would also address youth unemployment to a large extent, as more young people would be willing to work responsibly if fairly compensated.

Redefining gender roles and equality in parenting

One of the most crucial aspects of parenting reform involves addressing gender disparity. In Indian society, restrictions are often placed differently on boys and girls. Daughters are taught to be cautious, modest, take part-time jobs or internships. This not only teaches the value of money but also builds character. Youth who earn through honest effort develop respect for labor and empathy for others. Through such exposure, they understand that no job is inferior while sons enjoy leniency and freedom. Such differences shape the collective psyche of a

nation, influencing safety, equality, and justice. True equality begins at home. If parents insist that their daughters return home by 11 p.m., the same should apply to their sons. Safety should not be achieved by restricting women; it should be achieved by educating men about respect and responsibility. Self-defence should become a mandatory part of school and college education. Girls must be trained in techniques that allow them to protect themselves, and boys must be trained in emotional intelligence and gender sensitivity. Violence against women can be reduced only when parenting teaches mutual respect, not superiority. In many developed nations such as France and the Netherlands women can walk freely even at midnight because the culture promotes gender-neutral upbringing and strong law enforcement. In those societies both parents and governments share the same goal namely safety, respect, and accountability for all citizens. India too can create such an environment if awareness and equality are practiced in families as deeply as devotion and culture.

Reforming the Education System

Education is the mirror of a nation's progress. It transforms individuals into thinkers, inventors, and leaders. Yet, India's education system, though vast, still bears the imprint of an outdated colonial pattern focusing more on memorization than on understanding, and more on exams than on life skills. While the global economy shifts towards artificial intelligence, coding, robotics, and digital innovation, many Indian schools continue to teach theoretical content that holds little to stet practical value. A modern education system should blend academic excellence with creativity and life preparedness. Coding, data analysis, and artificial intelligence must become core subjects from the middle-school level. Communication skills, emotional awareness, financial literacy, and environmental education should be incorporated into the curriculum. Students must learn through exploration rather than repetition. Science laboratories, art studios, debate sessions, and innovation clubs should receive as much importance as mathematics or language classes. This transformation will reduce the burden of rote learning and replace it with curiosity-driven education. Furthermore physical education cannot remain secondary. Regular sports, yoga, and physical training

improve not only health but also teach discipline and teamwork. When a child learns to play fair and lead with honor, those qualities extend into adulthood. Another major concern is the quality of English education. Though most schools identify as English-medium, many students reach higher education without fluency in speech. English is not just a language; it is a global link for communication, career advancement, and cultural exchange. Teachers should be specially trained to develop conversational confidence, along with compulsory public-speaking activities. Finally, teachers must be given the respect and training they deserve. A teacher is the architect of the national character. Continuous teacher-development programs, better pay scales, and meaningful assessment systems are vital to restore dignity to this sacred profession.

Reforming Legal systems and social discipline

Every nation thrives when its laws are respected and implemented with fairness. India has progressive laws on paper, but the gap between legislation and enforcement remains large. Cases of corruption, violence, and discrimination often go unresolved due to administrative delay or lack of accountability. The spirit of law must be awakened at both institutional and individual levels. Legal literacy should become a mandatory subject in schools. Citizens must understand their fundamental rights and duties, learning how justice systems work. Only then can they identify and challenge wrongdoing effectively. Reform must also extend to civic behavior. Laws related to traffic, waste disposal, or noise pollution is often ignored not due to lack of awareness but because of indifference. Collective discipline must replace convenience. Every individual should feel morally obliged to follow the right path not out of fear of punishment but out of respect for the society.

The road to a better India

India's story is one of transformation. We have progressed from colonial rule to democracy, from rural economy to digital revolution, from social barriers to inclusivity. And yet, the true transformation that will define the next century lies within our people. If every citizen begins to think not only about what the country offers them but also about what they offer to the country, India's growth will

multiply manifold. Simple actions: throwing waste in bins, teaching children self-discipline, paying fair wages, or respecting traffic rules are small steps that together form a monumental change. Citizenship should be looked at as a duty, not an entitlement. True national pride thrives quietly in such moments of moral courage. India is more than a democracy; it is a destiny shaped by collective will. If each family becomes a school of values, each student a seed of innovation, each worker a model of integrity, and each leader a servant of truth, then we will have not only a strong India but a sublime one.

Conclusion: Dreaming of a new dawn

The India we dream of is not a distant fantasy, it is within reach. The India where the roads are smooth and rivers clean, where children grow independent and girls walk without fear, where education fosters imagination and integrity, where laws are respected and corruption is shunned. That India is possible when willpower meets wisdom. A nation's beauty lies not in its monuments but in its mindset. When we clean our streets, we cleanse our conscience. When we teach our children responsibility, we secure our nation's tomorrow. When we build with honesty, parent with love, learn with creativity, and govern with justice, India will shine more brightly than ever before. Let us then pledge to play our part not as critics or spectators but as active citizens of this great land. By nurturing discipline, compassion, and courage we can transform the poetry of hope into a portrait of pride. For India is already beautiful, but with our devotion, effort, and unity it can become truly divine; a nation that the world will admire not only for what it has but for what it stands for.

Let Inspiration Breathe

Anansha Debnath
Semester -1, Department of Psychology

It's strange really how inspiration doesn't seem to work on command. It won't answer when you call; it likes to arrive on its own terms, slipping in like a quiet friend in the early hours when no one is watching. But these days, life piles up around it---deadlines, projects, and expectations… even the dreams we are too afraid to let go of. And somewhere in all that inspiration fades like it's backed into a corner, unable to breathe.

I think sometimes all it needs is permission. Permission to take a pause, to just be, free of the weight we've heaped on it. But how often do we allow that pause? It's hard to create when you feel like everything has to mean something, like every stroke, every word has to be perfect, ready to impress.

But maybe we can let it be imperfect. May be creativity isn't always a performance; sometimes, it's just a conversation we have with ourselves in the quiet. And even if deadlines don't let up, maybe we can still make that space---just a small corner of it--- to let inspiration breathe.

Two Abandoned Souls

Anansha Debnath
Semester : 1, Department of Psychology

His hair, all rough and messy,
Untamed by the rough air.
And untouched by a comb
For months,
May be years.
His legs, all dirty,
Draped in a torn pair of shorts.
A thrown away shirt,
Now fits his body.

People pass by,
Ignoring him on the street.
One coin falls,
Another follows, hours apart.

Hunger? That's an unknown idea to him.
Maybe he does not know what death and life are.
Or he would not be sitting there still
On those abandoned stairs by the street.

Why? Or for what does he live?
Maybe he has never asked himself.
Maybe he just keeps going,
Without questions.
Or may be,
Maybe he hopes.
Hopes for something;
Something worth waiting for.

That street dog,
Who rarely gets petted by some kind-hearted man,
Maybe gets a biscuit or two while someone passes by,
Wags his tail just to get some love,
Some head pats.
Those innocent eyes-
Just existing.
Reasons? None.

As the dog approaches him by the street,
Gets so many head pats,
Followed by some biscuits- the ones the man got
After a whole week maybe,
Yet, he gives them away.

Two souls, abandoned by the passersby,
Abandoned from basic needs,
Look happy to be loved,
And for having their love adored by someone.

He loves the dog,
And the dog adores his love.
That is a lot-
Enough for their survival.

They needed some love and approval.
Just some of it.

Why You Should Join NCC

Rimi Besra
B.Sc. ,Semester: 3

Why you should join NCC

Hello, my name is Rimi Besra, a B.Sc. semester 3 student and a dedicated karate player. Being actively involved in sports, I often travel to different places to participate in tournaments. In such situations, leadership, quick decision-making, and the ability to stay calm under pressure are extremely important. That is why I joined the National Cadet Corps (NCC) to strengthen and improve my leadership qualities. As a karate player, I have learned discipline and focus, but NCC has taken those qualities to a higher level. NCC has not only taught me discipline but has also developed my sense of responsibility, punctuality, teamwork, and confidence. Through parades, camps, and training programs I realized that a true leader does not simply give instructions but stands beside the team, motivates them, and leads by example.

During NCC camps I had the opportunity to interact and work with cadets from different districts. Working together with them, solving problems, and completing tasks within limited time helped me grow mentally stronger. These experiences shaped my personality and improved my leadership skills. On the sports field, I now feel more confident and responsible than before. I can motivate my teammates, make timely decisions, and handle challenging situations with a calm mind. NCC has played a major role in building these qualities within me.

I strongly believe that NCC is not just an organization; it is a platform for character building and self-development. In my opinion, every girl should become self-reliant, mentally strong, and capable of leading with confidence. I hope to keep growing and inspire others through the values I have learned from NCC.

Joining the NCC is one of the best decisions a college student can make. Students can join NCC through their college if an NCC unit is available. At the beginning of the academic session, application forms are usually announced.

Interested students must fill out the form and go through a simple selection process, which may include a basic physical fitness test and an interview. Once selected they officially become NCC cadets and begin their journey of discipline and training.

The benefits of joining NCC are numerous. It develops leadership qualities, improves decision making ability, and teaches the importance of teamwork. NCC also enhances physical fitness and mental strength, helping students stay calm and confident under pressure. Moreover, NCC provides opportunities to attend various camps, meet cadets from different regions, and gain new experiences. Certificate holders, especially those with the 'C' certificate, receive advantages in defence service and certain government job opportunities.

Victoria Institution (College), one of the oldest women's colleges in Kolkata, provides students with the opportunity to join the NCC as part of its student activities. The college has an active NCC unit guided by capable faculty, and cadets participate in various social awareness drives, community service programmes, and environment campaigns throughout the year.

In today's world, it is not enough for girls to be educated academically. It is equally important to make independent decisions, know self-defence, be mentally strong, and posses leadership abilities. Through parades, camps, physical training and teamwork, we learn discipline, punctuality, and responsibility. Many girls are not fully aware of their own potential. But by joining NCC, they can discover their inner courage, skill, and leadership qualities. Here we learn to be strong in any situation. NCC makes girls self-reliant. It is not just about wearing a uniform; it is about a transformation of mindset where we shed our weaknesses and grow into confident and determined individuals.

Northernization:
How Bengal's culture is under threat

Rishita Mal
Semester : 3, BA MDC

India is the most populated country in the world, with more than 1.46 billion people. What makes India special is not just its size, but its deep cultural diversity. Within each state the language, food, festivals, music, and lifestyle vary. This diversity is India's true strength. From Kashmir to Kanyakumari and from Gujarat to Bengal, every region has its unique history and traditions. Yet today, when people talk about "Indian culture," they often mean something very specific: certain version of North Indian culture, Hindi language, Bollywood, North Indian festivals, and customs have come to represent India on the national and global stage.

This growing influence of North Indian culture over others is what I term as "Northernization". It can be likened to Westernization, where Western culture spreads across the world. Northernization is when North Indian traditions gradually threaten to replace the cultures of other Indian regions.

This is happening quietly, but its impact is very real—especially in Bengal. West Bengal is not just another Indian state. It is one of India's richest cultural regions. Bengal has given India some of its greatest thinkers and artists—Rabindranath Tagore, Satyajit Ray, Swami Vivekananda, Bankim Chandra Chattopadhyay, Amartya Sen, and many more. Bengali literature, music, art, and cinema has shaped the way India thinks and feels.

Durga Puja is not just a religious festival in Bengal. It is a celebration of art, creativity, and community. The beautiful pandals, the idols, the music, the food, and the street life make it one of the most unique festivals in the world.

Bengali culture is known for its emotional depth, creativity, and openness. It respects tradition but also values questioning and free thinking. This culture has survived for hundreds of years. But today it is facing a new challenge.

Northernization happens mainly through :

Bollywood films and songs, Hindi television shows, Social media, National festivals promoted in a North Indian style, and Hindi being treated as India's main language.

Because of this North Indian customs are slowly becoming representational of the entirety of Indian culture, while other regional traditions are often treated as secondary or simply local. This creates a problem. When one culture becomes dominant, others begin to gradually fade away.

One clear sign of Northernization is how Bengali festivals, art forms, and certain Bengali rituals traditions are being renamed.

For example, *Kaali Puja* is now often called *Diwali* reducing its uniqueness. *Durga Puja* is referred to as *Navratri*, as if they are one and the same. *Alpona* (Bengali floor art) is replaced by rangoli. Surprisingly even Bengali wedding rituals are being replaced by *mehendi* and *sangeet*.

These names may seem small, but they are not. Names carry history. When we stop using Bengali names, we slowly stop remembering what makes our traditions unique.

We have to remember that *Durga Puja* is not *Navratri* and *Kaali Puja* is not *Diwali*.

They are different festivals with different meanings. Calling them by North Indian names slowly erases their Bengali identity.

Food is another area where Northernization is very clear. In Bengal, fish and meat are not just food—they are part of religion and culture. In many Bengali traditions, fish is offered to the goddess as a symbol of prosperity. Eating non-vegetarian food during festivals has always been normal in Bengal. But today many Bengalis are judged or mocked by North Indian standards that see vegetarian food as more “pure.” This creates the idea that Bengali traditions are somehow wrong or less religious. This is unfair as Hinduism has always had multiple ways of worship. There is no single correct tradition.

Changes in Purulia, Bankura, and Birbhum :

The effects of Northernization are more visible in rural Bengal, especially

in Purulia, Bankura, and Birbhum.

These areas are known for their folk traditions, tribal culture, and village festivals.

Purulia

Purulia is famous for Chhau dance and tribal traditions. But today, young people are more influenced by Bollywood music and Hindi social media than by their own folk culture. Traditional songs and local dialects are slowly disappearing.

Bankura

Bankura's terracotta temples and Shakta traditions are being replaced by North Indian festivals and North Indian architectural styles. Hindi devotional songs are becoming more common than Bengali kirtan.

Birbhum

Birbhum is the land of Bauls—mystic singers who believe in love, humanity, and spiritual freedom. But Baul culture is slowly fading from young people's lives, while Hindi religious content is growing.

These changes are not just about modern life. They show how one culture is slowly pushing out another. Some may say, "What is wrong with adopting new traditions?" There is nothing wrong with learning from other cultures. But the problem begins when people forget their own culture. If Bengali children know Bollywood stars but not Rabindranath Tagore, if they know Karwa Chauth but not Lakshmi Puja, something important is being lost.

A culture survives when people remember who they are. Fusion is good, erasure is not. Cultures evolve and culture mixing is natural. Bengal has always absorbed ideas from many places. It does not need to reject anyone. It only needs to remember itself.

Echoes of Home

Peter Minj
(Asstt. Professor, Department of Eng.)

I
In a city

Roshan Toppo stared at his phone which rang for the third time within ten minutes. He couldn't have ignored the call for ever. But he wanted to avoid it, having a feeling if he picked up it wouldn't be the words he would want to hear. "Hello!" "Mr.Toppo, why are you not picking my call?" Roshan hated that tone. "Sorry, sir. The phone was on silent." "Ok, listen", the voice softened a bit. "I have a bad news for you." There was a pause. "I can't grant you the leave. I am sorry." Roshan sulked. He wanted to shout back but he controlled himself. "But sir I applied early. I have to go sir."

The stern voice continued, "I am sorry Roshan. Vijay has had an emergency. I need a stand-in. I can't let you go."

II
In a village

An old woman pours out a light-grey coloured liquid from an earthen-pot into a *kheta* Her forehead is creased and she has a tattoo of a cross on it. It's a plain tattoo, two small dark lines at a right-angle. With the help of another woman she distributes the *khetas* to the men and women who are seated on the floor in the open space outside the house. She greets each of them as she hands them a *kheta*.

The men and women converse with each other. They share a laugh. And then a man asks this old woman if her son is going to come home.

The old woman tries to hold back her tears. She wistfully says, *"Dharmes hi onderna ra'ee hole amaan araage bar'os jun"* (If God is willing he will definitely come to see us).

She continues her chit-chat cheerfully and then all of them break into a folk-

song. It talks about a pigeon which has flown away towards the sky from its golden cage and the keeper wonders if it will ever return to him again.

In the village *akhra* (dancing ground) the young men beat the mandars and the nagadas with great vigor and enthusiasm. The Karam tree is at the center. The village girls, married women and elderly women hold each other's hands forming a chain and sing along and dance rhythmically to the beats around the Karam tree. The steps are simple, well-synchronized and the whole group moves in such cohesion. They keep singing even after their throats strain.

III
In a city

Roshan sat in the cafe sipping a glass of hot coffee.

He took small sips and pondered about things. The memories of Karam festival and Christmas of his younger days rushed back to him. He had forgotten the lyrics of some of the songs, but he could still retain the tune, and his body could still move to the rhythm of those songs, almost instinctively. He deeply missed his family and the celebrations. It had been years since he had participated in those festivals. Especially since he had moved to the city for work.

He felt guilty. He thought he should have tried harder to get leave. Not only this time but before too. How could he not visit his home, his mother for such a long time. He was fed-up playing the nice guy trying to work harder and harder all the time. Promotion, which wasn't guaranteed, would mean more work but what was the point of working if one could not even see his family.

They'll be dancing in the village now, he said to himself.

"I think you should go home," His friend broke his thought handing him a paper-bag of French-fries.

"Yeah I want to. But my boss never lets me go. And damn that Vijay, he always does this."

His friend chuckled," You should speak like that more often."

"What? Curse more?"

"No, no. I meant you should let your feelings be heard."

Roshan nodded munching the fries.

"You really should visit home. It's been long. And it's an important festival of your community and it would be a great time to be at home."

IV
In a village

Roshan steps down from the bus. The smell of the soil freshens him up. The beating of the drums and the vibrant tunes of the songs thrills his ears. But a familiar sound jars and spoils the moment. Just for a while. Roshan sees the number. He turns off the phone.

The old woman with the wrinkled face and the cross tattoo on her forehead lights up. Her eyes are watery, with joy. She embraces Roshan.

– THE END –

NOTE: This short story is an adaptation of the short film "Sona gahi Pinjra" (The Golden Cage), which was directed by Biju Toppo (a tribal documentary filmmaker from Ranchi, Jharkhand) and released in 2011.

بارش کی خوشبو میں پرانی یادیں

ہوا نے ہولے سے کانوں میں یہ سرگوشی سنائی ہے
کہ بادل نے سکوتِ شب میں خاموشی گنوائی ہے
مہکتی بوندوں نے چھیڑی ہیں یادوں کی حکایتیں
نمی میں گھل گئی ہیں جیسے چاہت کی روایتیں
رم جھم کے ساز پر دل کی تنہائی دھڑکتی ہے
برستی یاد کے موسم میں ایک دنیا مہکتی ہے
خیالوں میں بسا وہ چاند سا چہرہ ابھر آیا
نفس میں چاہتوں کا ایک مانوس عطر چھایا
ساون کی بوندیں، بھیگی یاد، اور چاہت کا وہ عالم
اترتی ہے دلوں میں خواہشِ بے نام بن کر نم
قطروں کی سرگوشی میں ہے دل کی کوئی پوشیدہ بات
بھیگی پلکوں پہ ٹھہری ہے پرانی یاد کی بارات
تنہائی کی راہوں میں ہے یادوں کی مہک رقصاں
تیرے عشق کی خوشبو سے ہے ہر قطرہ ابھی تاباں
فضا کی ہر صدا میں نام تیرا ہی سنائی دے
مجھے ہر بوند میں بس عکسِ جاناں ہی دکھائی دے

کائنات
(بی اے آنرس)
سمسٹر-III

عہد حاضر اور خود اعتمادی کا مسئلہ

درجِ بالا سوال صرف چند افراد یا ایک شخص کا ہی نہیں، یہ سوال تو ہم سب کی زندگیوں کے پیچ و خم میں خاموشی سے پلتا رہتا ہے۔ کبھی کسی کے دل میں دھیرے سے دستک دیتا ہے اور کبھی کسی کے ذہن میں بنا آواز کے شور مچاتا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو وقت، جگہ اور رشتوں سے آزاد ہو کر ہر انسان کے اندر جنم لیتا ہے۔ اکثر وہ باتیں جو ہم کبھی دوسروں سے نہیں کر سکتے وہ ہم خود سے کر جاتے ہیں، کبھی ہمارے نہ ملنے والے سوالوں کے جواب ہمارا ضمیر دے جاتا ہے، اور کبھی ایسے سوال کھڑے کر دیتا ہے جن کا جواب ڈھونڈنا ناممکن ثابت ہو جاتا ہے۔ غالباً یہ سنتے آئے ہیں کہ فلاں فلاں بندہ یا بندی حسین و جمیل ہے، ایسی ہے ویسی ہے، لیکن مجھے کبھی بھی اس لفظ کے صحیح معنی نہیں معلوم ہوئے۔ پھر بھی ذرا اس کو تلاش کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ حسن، یہ خوبصورتی، یہ دلکشی اور یہ شگفتگی صرف ایک چہرہ نہیں، یہ کئی نازک نقشوں کی، کئی لطیف احساسوں اور کئی خاموش کیفیات کا مجموعہ ہے۔ کبھی یہ چمکیلی رنگت میں جھلک جاتی ہے جو دور سے ہی مہکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اور کبھی چاند سا روشن گندمی چہرہ اپنی شرم و حیا کی لالی کے ساتھ دل میں ٹھہر جانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اکثر ایسی پلکیں جب آہستہ سے

جھکیں تو یوں لگے کہ وقت خود رک کر اسے داد دے رہی ہے۔ اور باریک نقش جسے قدرت نے بہت احتیاط سے ایک الگ ہی نزاکت سے بنائے ہیں۔ یہاں خوبصورتی کی مختلف ومتنوع قسم کی تعریف کرنے کی ایک ادنیٰ سی کوشش کی ہوں۔ ان میں سے آپ کے پاس جیسی بھی خوبصورتی موجود ہو۔ لوگوں کے پاس، اس سے مختلف بیوٹی اسٹینڈرڈز ہونگے، بیوٹی بھی کون سی جو فنا ہو جانے والی ہے۔ ختم ہو جانے والی، مٹی سے آئی ہے مٹی میں سما جانے والی۔ لیکن آیئے ذرا اس حسن کی بھی بات کریں جو کہ ابدی ہے۔ اس جہان اور اس جہان، دونوں جہانوں میں جو کام آتی ہے وہ حسن اخلاق ہے جو حقیقتاً شخصیت کو روشن کرتی ہے، جسے ہم باطنی حسن یا باطنی خوبصورتی بھی کہتے ہیں۔ باطنی خوبصورتی صرف شکل وصورت تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ دل اور کردار کی نرمی میں بھی جھلکتی ہے۔ ایک شخص کے اچھے اخلاق، مہربانی اور نرم رویہ سب کے دل کو محظوظ کرتا ہے۔ اس طرح دل کی نرمی اور دوسروں کے لیے ہمدردی اور محبت ونرمیت کا جذبہ لوگوں پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ یہی وہ خوبی ہے یعنی قلبی سکون اور باطنی طہارت جسے روحانی حسن کہتے ہیں، ''جو شخصیت کو ایک خاص دلکشی اور کشش عطا کرتا ہے۔ مہربانی اور شفقت یعنی دوسروں کی مدد کرنے کی صلاحیت باطنی خوبصورتی کی سب سے واضح پہچان ہے۔'' مجھے ان لوگوں پر بہت ترس آتا ہے جن کو اللہ تبارک وتعالیٰ نے خوب خوب شکل سے نوازا ہوا ہے، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کے لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ ان سے زیادہ بدشکل کوئی بھی نہیں۔'' آپ سب سے میری گزارش ہے کہ خوب سیرت اور پاکیزہ اخلاق حسن کے بارے میں فکر کریں تاکہ جسے اللہ کے پاس جانا ہے وہ دائمی خوبصورتی لیے ہو نہ کہ عارضی خوبصورتی جسے زمین بوس ہونا ہے۔

عصمت پروین
بی۔اے، اُردو آنرز
(سمسٹر V)

ڈاکٹر فریدہ انور
شعبۂ اردو
وکٹوریہ انسٹی ٹیوشن (کالج)

خودی اور خود پسندی: تعمیرِ ذات اور تخریبِ انا کے درمیان میزانِ عمل

''خودی'' کیا ہے؟ اس سیدھے سادھے اور مختصر سے سوال کا اکثر و بیشتر لوگوں نے دوٹوک جواب ''خود پرستی، خود پسندی، خودسری وغیرہ وغیرہ سے دیا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر فلسفیوں، ماہرین نفسیات اور صوفیائے کرام نے صدیوں سے بحث کی ہے۔ مختلف محققین اور مکتبہ فکر کی آرا مختلف رہی ہے۔ مشہور مفکر اور فلسفی، شاعر ڈاکٹر سر محمد اقبال کا تصور خودی کا نقطۂ نظر فلسفیانہ اور روحانی ہے۔ انہوں نے اپنے مجموعۂ کلام میں خودی کا فلسفہ نچوڑ کر ہمارے روبرو رکھ دیا ہے۔ جہاں جہاں انہوں نے خودی کا ذکر کیا ہے، خودی کی طاقت اور اس کے اثرات کو بڑے دلنشیں انداز میں سمجھانے کی کوشش ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اُردو میں فلسفہ خودی کا سب سے پختہ اور خوبصورت اظہار ''بال جبرئیل'' میں ملتا ہے۔

خودی کا سرِنہاں لا الہ الا اللہ
خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ
خودی سے اس طلسم رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں
یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا
حیات کیا ہے خیال و کفر کی مجذوبی
خودی کی موت ہے، اندیشہ ہائے گوناگوں
خودی کیا ہے رازِ درونِ حیات
خودی کیا ہے بیداریٔ کائنات
یہ موج نقش کیا ہے تلوار ہے
خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے

خودی یوں تو بظاہر چھوٹا سا چار حرفی لفظ ہے۔ مگر اس کی وسعت بے پایاں اور فکر رسائی کا اندازہ لگانا جوئے شیر لانے کے برابر ہے۔ لفظ ''خودی'' کو معنی و مفہوم کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی قسم کی خودی وہ ہے جس کے معنی خودغرضی، مطلب پرستی، کبر و نخوت وغیرہ وغیرہ سے لیا جاتا ہے۔ خودی کی دوسری قسم وہ ہے جس کے معنی خود شناسی اور معرفتِ نفس وغیرہ ہے۔ باوجود اس کے ''خودی'' کا لفظ جوں ہی ہمارے کانوں تک پہنچتا ہے۔ ہمارے فہم و ادراک میں لاشعوری طور پر لفظ ''خودی'' کا مطلب خودی غرضی، مطلب پرستی، انانیت، کبر و نخوت، غرور و تکبر وغیرہ کا خیال منقش ہونے لگتا ہے۔ جب کہ اس لفظ کا جو دوسرا معنی و مفہوم ہے جسے ہم خود مختاری اور عزت نفس وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن و عقل تک اس کی رسائی بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ کیوں کہ آخر الذکر معنی کے دانائے راز کی تعداد قلیل نظر آتی ہے۔ البتہ تعلیم یافتہ طبقہ اس لفظ کے معنی و مفہوم سے آشنا ضرور ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سنجیدہ فکر و نظر رکھنے والے لوگوں کا

فقدان ہے۔عموماً لوگ لفظ ''خودی'' کو اول الذکر معنی سے مراد لیتے ہیں۔مثلاً اگر یہ کہیں کہ فلاں شخص ''خودی'' میں ڈوبا ہوا ہے۔تو اس کا سراسر یہ مطلب اخذ کر لینا غلط ہوگا کہ وہ نہایت ہی خودغرض انسان ہے۔ اس کی ذات میں خود غرضی اور مطلب پرستی ملحق ہے۔ اس سلسلے میں بے شمار مثالیں دی جاری رہی ہیں،طرح طرح کے فقرے بھی کسے جاتے رہے ہیں جیسے ''خودی اور خدائی میں بیر ہے'' یعنی خدا غرور کو پسند نہیں کرتا اور مغرور لوگوں کا سر ایک نہ ایک دن رب العالمین کے سامنے ختم ہوتا ہے۔ بات درست بھی ہے۔حد سے زیادہ غرور وتکبر خدا کو بھی ناگوار گزرتا ہے۔ خدائے سخن میر تقی میرؔ نے بھی کیا خوب کہا ہے۔

جس سر کو غرور آج ہے یاں تاج وری کا
کل اس پہ یہی شور ، پھر نوحہ گری کا

دراصل ''خودی'' ایک ذو معنی لفظ ہے ایک مثبت دوسرا منفی۔اب یہاں میں اس کے مثبت پہلو پر روشنی ڈالنا چاہوں گی۔یعنی خود شناسی اور معرفت نفسی۔خودی پر عبور حاصل کر لینے کا سیدھا راستہ خود میں ڈوب کر خود کی تلاش ہے۔خود کو یعنی اپنے نفس کو پہنچاننے کی لگن اور تڑپ ہی خودی تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ہے۔علامہ اقبال کے نزدیک بھی خودی میں عرفان حاصل کرنے کا سیدھا راستہ انسان کے اپنے نفس سے ہو کر گذرتا ہے۔اور جس کی تلاش میں اپنے ''من'' اور اپنے ''نفس'' میں ڈوبنا ضروری ہے۔لیکن ساتھ ہی وہ اس بات کی بھی تلقین کیا کرتے ہیں کہ اس کی تلاش میں آپ اپنی ہستی کو ہی مدغم نہ کر دیں۔جس طرح قطرہ سمندر میں مل کر اپنی ہستی کھو بیٹھتا ہے۔ ان کے نزدیک خودی حاصل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ خودی کی تلاش میں ''دورن بینی'' اور ''میں'' کی تلاش ضروری ہے۔ اور یہ عرفان اپنے من میں ڈوبنے کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے۔علامہ اقبال کا یہ شعر دیکھئے:

اپنے من میں ڈوب کر پا یا سراغ زندگی
تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن

اقبال کے نزدیک خودی سے مراد احساسِ نفس، تعین ذات اور اپنی پہچان ہے۔یہ ایسی راہ ہے جس سے گذرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو جلا بخش کر انسانیت کے بلند ترین درجے پر فائز ہوتا ہے۔ جہاں اسے اپنی انفرادی حقیقت کا ادراک بھی ہوتا ہے اور اللہ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے۔لہٰذا جس نے خودی کی منزل پر عبور حاصل کر لیا اس نے اپنے مقصد حیات کو پالیا۔اور اپنے وجود کا مقصد پہچان لینے کے بعد اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے مرد مومن کے اندر ایک منظم جہت عمل بیدار ہوتی ہے جو اسے جہانِ تازہ کی سمت لے جاتی ہے۔جہت وعمل ہی وہ شئے ہے جو زندگی کے جمود کو توڑ کر اسے ذوقِ سفر اور تڑپ عطا کرتی ہے۔قدیم افکار کے مطابق انسان کو ایک مجبور فطرت مخلوق سمجھا جاتا تھا۔یعنی زندگی کے ہر پہلو کو تقدیر کے حوالے کر کے تدبیر سے کنارہ کشی اختیار کر لینا ہی مقدر سمجھ لیا گیا تھا۔اس نظریۂ حیات سے انسان کی زندگی میں جہت عمل کی جگہ نہ صرف سکوت و جمود طاری ہو جاتا ہے، بلکہ اس کا مقصدِ حیات بھی فنا ہو کر رہ

جاتا ہے۔ دراصل اپنی حقیقت کی معرفت اور پھر اس کی بقا کے لیے جہد عمل کو اختیار کرنا ہی خودی پر عبور حاصل کرنا ہے۔

لفظ 'خودی' کے متعلق اب تک کی گئی بحث کا حاصل یہ ہے کہ خودی سے مراد اپنے ''نفس کی پہچان'' ہے۔ درحقیقت اپنی ذات کا ادراک ہی معرفتِ الٰہی کا پہلا زینہ ہے، جیسا کہ مقولہ ہے ''جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا'' من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔

خدائے سخن میر تقی بھی اپنے اسی شعر میں اس حقیقت کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں:

پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں
معلوم اب ہوا کہ بہت میں ہی دور تھا

جب انسان کو اپنی ''خودی'' پر عرفان حاصل ہو جاتا ہے، تو وہ اس بلند مقام پر فائز ہو جاتا ہے جہاں موت اور حیات اس کے لیے بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہم نے لفظ ''خودی'' کی ماہیت کا مشاہدہ کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اس کے دو متضاد پہلو ہیں، جو ایک دوسرے کی ضد ہیں اور متضاد اثرات دکھاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا پہلو (تکبر وانا) وہ ہے جس کی راہ پر چلنے والا انسان کبھی رضائے الٰہی حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان اپنی ذات کو ہی کل کائنات سمجھ بیٹھتا ہے اور غرور کے نشے میں اپنے خالق کو فراموش کر دیتا ہے۔ یہ راستہ انسان کو گمراہی کی دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔ جب کہ دوسرا پہلو (معرفتِ نفس) وہ ہے۔ جس کی بدولت انسان کی رسائی رب کریم تک ہو جاتی ہے یہاں انسان اپنی روح کی حقیقت کو پہچانتا ہے، انھی صلاحیتوں کو خدا کی رضا کے تابع کر کے عجز وانکسار اختیار کرتا ہے۔ جب انسان اس خودی کو پا لیتا ہے تو اسے کائنات کی ہر شئے ہیچ نظر آتی ہے۔ اور وہ موت کے خوف سے آزاد ہو کر حیاتِ جاویدانی حاصل کر لیتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو بندہ سے ''مردِ مومن'' بنا دیتا ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ خودی کا سفر دراصل ''میں'' سے ''تو'' تک کا سفر ہے۔ جب انسان اپنی خودی فرعونی یعنی منفی انا کو مٹا کر حقیقی روح کا ادراک کر لیتا ہے تو وہ بندگی سے مقامِ بندگی خاص پر فائز ہو جاتا ہے۔ یہی وہ نکتہ ہے۔ جہاں پہنچ کر انسان کو کائنات کے اسرار ورموز سمجھ میں آنے لگتے ہیں اور وہ یہ جان لیتا ہے کہ اس کی ذات کی اصل بقا اللہ کی رضا میں خود کو فنا کر دینے میں ہی پوشیدہ ہے۔